সেপ্টেম্বর ২০১৮ ❑ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৫

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

কাজী নাফিসা তাবাস্‌সুম, একাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

কাজী ইসতিয়াক ইসলাম (ইফতি), ৭ম শ্রেণি, ধানমন্ডি বয়েজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

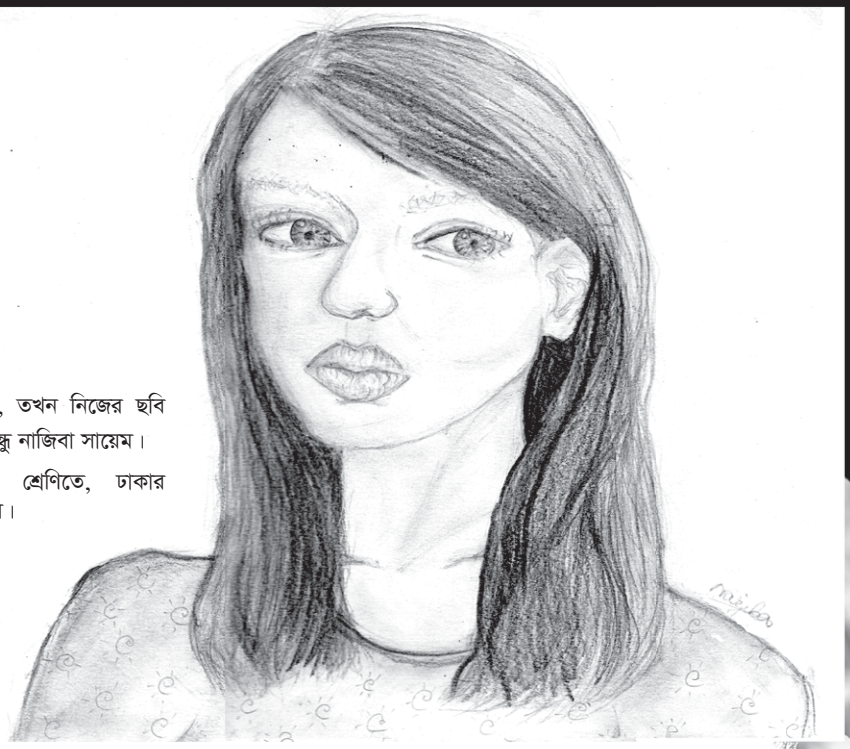

ভাল্লাগে না যখন, তখন নিজের ছবি এঁকে পাঠিয়েছে বন্ধু নাজিবা সায়েম।

ও পড়ে সপ্তম শ্রেণিতে, ঢাকার মাস্টারমাইন্ড স্কুলে।

সম্পাদকীয়

নবারুণ কেবলই শোনে, তোমাদের নাকি ভাল্লাগে না। ঠোঁট উলটিয়ে, কাঁধ বাঁকিয়ে কী রকম একটা মুখ যে করো আর বলো, ভাল্লাগে না, ভাল্লাগে না! 'ভাল্লাগে না' কীভাবে 'ভাল্লাগে'তে বদলে দেওয়া যায়, সে চেষ্টা তো করতেই হবে।

প্রিয় বন্ধু, যখনই মনে হবে, নবারুণকে জানাতে চাও ভাল্লাগে না'র খোঁজখবর, জানিয়ে দিও। দেখবে, 'ভাল্লাগে না'র 'না'-কে ইরেজার দিয়ে মুছে দিব্যি 'ভাল্লাগে' বানিয়ে দেবে নবারুণ। সত্যিই কিন্তু 'না' সবসময় বড্ড ঝামেলার। ওকে 'হ্যাঁ' আমরা করেই ছাড়ব।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মন

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

মূল্য : ২০.০০ টাকা

সূচি

নিবন্ধ

৪ প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ/ শাহানা আফরোজ
৬ কবি কামিনী রায়/ রহিমা আক্তার মৌ
১২ টিকটিকির লেজ!! আজব কিন্তু গুজব না/ অর্ক রায় সেতু
২০ প্রতিবিম্ব/ রুকাইয়া রচনা
২৭ বড়ো হওয়ার স্বাস্থ্য-সত্য/ ডা. নুরুল হক
৩০ ইন্টারনেটে থাকি নিরাপদ/ মেজবাউল হক
৩১ বই আলোচনা: তোমাদের জন্য জরুরি বই আহমেদ কাওসার
৩৫ মায়ের দেওয়া খাবার খাই, মনের আনন্দে স্কুলে যাই/ জান্নাতে রোজী
৩৮ শরীরের যত্নে আমাদের দায়িত্ব/ জাহিদুল ইসলাম
৪৩ বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর কৈশোর: কিছু না বোঝার কাল রাবেয়া ফেরদৌস
৪৬ টিনএজের ৮টি ব্যায়াম/ নূহু আব্দুল্লাহ
৫৩ শরতের চালচিত্র/ ফরিদ আহমেদ হৃদয়
৫৫ সাদা মেঘের ভেলা/ নিশাত সুলতানা
৫৭ বাল্যবিয়েকে লালকার্ড/ কবির কাঞ্চন
৬৩ বয়ঃসন্ধিকালীন খাবার/ জামাল উদ্দিন
৬৪ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস/ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৬৪ নবারুণ বন্ধুদের খোঁজখবর/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

ভাল্লাগে না ভাল্লাগে

২২ নিতু চৌধুরী/ অভ্র ফারিহা
২৩ মুন্সী তাজীম মাহমুদ/ ফারদিন ছামীম ভুঁইয়া/ জুনায়েদ তৌহিদ/ মাহনুর রৌশন মাহমুদ
২৫ 'ভাল্লাগে না' কেন/ সাঈদ চৌধুরী

গল্প

৯ আয়নামতী ও নিতুর গল্প/ দিলারা মেসবাহ
১৪ পটলের হারিয়ে যাওয়া/ দীলতাজ রহমান
১৮ তিনটি কোয়েলের গল্প/ মাহমুদা সুলতানা
৩২ আকাশে মেঘের আনাগোনা/ বর্ণালী চৌধুরী
৪৮ ধারাবাহিক গল্প: মুক্তিযুদ্ধের দিন-রাত্রি/ আবুল কালাম আজাদ
৬২ আনন্দপুরী/ মাসুমা রুমা

আঁকা ছবি

২য় প্রচ্ছদ: কাজী নাফিসা তাবাস্‌সুম/ কাজী ইসতিয়াক ইসলাম (ইফতি)
শেষ প্রচ্ছদ: বিন্তি প্রতিকা
১ নাজিবা সায়েম
২ সিতি আলিজা ইসলাম
৩২ সাফওয়ান রেজা অদ্রি
৩৫ সংগ্রাম আহমেদ কবীর
৩৮ বিন্দি পুষ্পিকা
৪২ বিন্নি হিমিকা
৫৬ স্বর্ণা রহমান

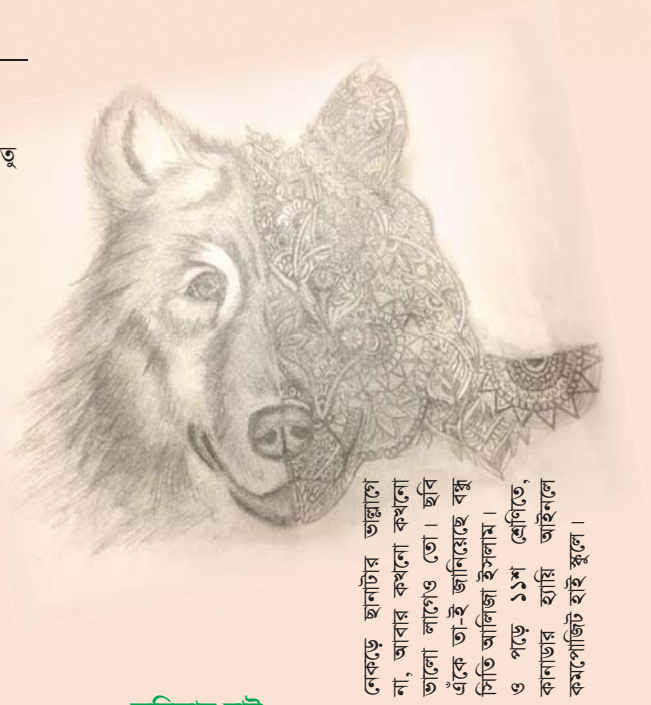

নেকড়ে ছানাটার ভাল্লাগে না, আবার কখনো কখনো ভালো লাগেও তো। ছবি এঁকে তা-ই জানিয়েছে বন্ধু সিতি আলিজা ইসলাম। ও পড়ে ১১শ শ্রেণিতে, কানাডার হ্যারি আইনলে কমপোজিট হাই স্কুলে।

কবিতার হাট

৩ সনজিত দে
৭ মো. মোক্তাদির হাসান
৮ তাসনিম মাহদী/ দিলরুবা পুষ্প/ রায়হান হোসেন
১১ শারমিন সুলতানা রীনা/ করুণা আচার্য শফিক ইমতিয়াজ/ মাহফুজা আক্তার মুন্নি
১৩ সুমন্ত বর্মণ
২৬ সুমাইয়া আক্তার
৩৪ রাকিব আজিজ/ মোহাম্মদ মারুফুল
৫২ রোকসানা আক্তার মুন্নী/ মাহবুব এ রহমান কবি লিয়াকত আলী চৌধুরী/ সানজানা শরিফ
৫৪ মিনতি বড়ুয়া/ মো. মনিরুজ্জামান মনির
৫৬ জাহাঙ্গীর আলম জাহান
৬০ ব্রত রায়

কমিক্স

৩৬ আহসান হাবীব

সহযোগী শিল্পনির্দেশক : সুবর্ণা শীল
অলংকরণ : নাহ্‌রীন সুলতানা
যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

বঙ্গবন্ধুর কন্যা তুমি

সনজিত দে

পঁচাত্তরের পরে যখন
ওলট-পালট সব
চলছে শাসন মিলিটারির
আহা কী উৎসব!

এমন করে করে ওরা
দেশকে গিলে খায়
গণতন্ত্র ধীরে ধীরে
মৃত্যু আশঙ্কায়।

তখন এলে জননেত্রী
শেখ হাসিনা তুমি
তোমায় পেয়ে আকুল হলো
প্রিয় জন্মভূমি।

তোমার জন্য শেখ হাসিনা
শুধু তোমার জন্য
প্রযুক্তি আজ হাতের মুঠোয়
ধন্য তুমি ধন্য।

আমি অধম অখ্যাত এক কবি
তাই এঁকেছি তোমারই এ ছবি।

জন্মদিনে কী আর দেবো
ক্ষুদ্র উপহার?
তুমি হলে মহান জাতির
বিশাল অহংকার।

স্বল্প আয়ের দেশ থেকে আজ
মধ্য আয়ের দেশ
বিশ্ব মাঝে উন্নত আজ
আমার বাংলাদেশ।

জন্মদিনের শুভেচ্ছা
প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সংযুক্ত আরব আমিরাতের পত্রিকা *দ্য ডেইলি খালিজ টাইমস* কার্টুনটি প্রকাশ করেছে, যেখানে কেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'মানবতার মা' তা সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রথম সন্তান হিসেবে কোল আলো করেছিলেন যিনি, তিনি আজ বিশ্বকে আলোকিত করছেন উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জাদুকরী নেতৃত্বে।

মিয়ানমার দেশটি ওদের নাগরিক রোহিঙ্গাদের নির্মমভাবে দেশছাড়া করলে বাংলাদেশ সীমান্তে জড়ো হওয়া অসহায় মানুষদের আশ্রয় দেন তিনি। বিশ্ব তাঁকে নাম দিয়েছে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' বা 'মানবতার মা'।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ

শাহানা আফরোজ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন- 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।' বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনে দশটি বিশেষ উদ্যোগ হাতে নিয়েছেন। এই উদ্যোগসমূহের শতভাগ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার।

একটি বাড়ি একটি খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

আমাদের দেশের প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প গ্রহণ করেছে বর্তমান সরকার। এই বিপ্লবের মূল সুর হলো– 'দিন বদলের স্বপ্ন আমার, একটি বাড়ি একটি খামার'। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের সাথে ১ জুলাই ২০১৬ সালে যোগ হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।এর ফলে গ্রামের প্রতিটি দরিদ্র পরিবার অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে গড়ে উঠছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্প

দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশে আচমকা হাজির হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এতে অনেকে সব হারিয়ে হয়ে যায় ছিন্নমূল। আশ্রয় নেয় সরকারি জমি অথবা বিভিন্ন স্থাপনায়। এসব মানুষের পাশে আছেন আমাদের প্রিয় নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ছিন্নমূল অসহায় পরিবারের পুনর্বাসনে উপহার দিয়েছেন 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'। যার প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার'। আমাদের জাতির স্থানীয় প্রশাসন এবং সশস্ত্রবাহিনীর যৌথ সহায়তায় গড়ে উঠেছে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো। আশ্রয়ণ কোনো সাহায্য প্রকল্প নয় হতদরিদ্র মানুষের ন্যায্য অধিকার। জনবান্ধব সরকার সে অধিকার নিশ্চিত করেছেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল প্রযুক্তি মানে ওয়েবসাইটভিত্তিক সরকারি সকল সুযোগসুবিধা। সেবা যখন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে তখনই বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের সামনে ২০০৮ সালে নির্বাচনি ইশতেহারে এই স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন। আর ২০০৯ সালে স্বীকৃতি দিয়ে তৈরি করেন রূপকল্প-২০২১। স্বচ্ছতার সাথে স্বল্প সময়ের মধ্যে যাবতীয় তথ্য ও সেবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরা এ উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। যা ইতিমধ্যেই সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। যে দেশে শিক্ষিতের হার যত বেশি সে দেশ তত উন্নত। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি'। এই কর্মসূচির স্লোগান হচ্ছে- 'শিক্ষিত জাতি সমৃদ্ধ দেশ/ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ।' এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে - তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া।

নারীর ক্ষমতায়ন

জনশক্তিনির্ভর বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন বর্তমান সরকারের অনুকরণীয় সাফল্য। প্রধানমন্ত্রীর উৎসাহ আর গৃহীত কর্মসূচি এদেশের নারীদের পৌঁছে দিয়েছে এভারেস্টের চূড়ায়। নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ প্রণয়নের পাশাপাশি গড়ে তুলেছেন অনেক আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প। প্রণয়ন করা হয়েছে সহিংসতা প্রতিরোধ আইন-২০১৫। এছাড়াও নারীদের নেতৃত্ব সৃষ্টি করে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে বিদ্যুৎ। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ-এর উন্নয়নে 'ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্প শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের একটি। এর স্লোগান হচ্ছে- 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ/ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ।' প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে দেশের সর্বত্র এখন বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ, উইন্ডমিল, বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। দেশে প্রথমবারের মতো পরমাণু বিদ্যুতের উৎপাদনও শুরু হতে যাচ্ছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

দেশের সকল মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে শেখ হাসিনার সরকার বদ্ধপরিকর।দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবাসহ সকল জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে গড়ে তুলেছেন একটি কমিউনিটি ক্লিনিক। সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও শিশুদের শতভাগ টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনা। শিশুদের দিবাকালীন সেবা প্রদানসহ আরো অনেক কার্যক্রম এ প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ ও ২০৪১-এর মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি' হাতে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।এর স্লোগান হচ্ছে-'শেষ হাসিনার বারতা, গড়ো সামাজিক নিরাপত্তা'। বয়স্ক, অক্ষম, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের আর্থসামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং ভূমিহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করা এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য।

বিনিয়োগ বিকাশ

বাংলাদেশ এক বিপুল সম্ভাবনার দেশ। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'বিনিয়োগ বিকাশ'। এর স্লোগান হচ্ছে, 'শেখ হাসিনার নির্দেশ/বিনিয়োগবান্ধব বাংলাদেশ'।সম্প্রতি বিশ্ব মানচিত্রে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

পরিবেশ সুরক্ষা

শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগের একটি হচ্ছে 'পরিবেশ সুরক্ষা'। 'শেখ হাসিনার নির্দেশ/জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ' স্লোগান নিয়ে এ উদ্যোগ এগিয়ে চলছে। দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকরণকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, গবেষণা, উদ্ভিদ জরিপ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও বন নিশ্চিতকরণ এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন-২০১০, পরিবেশ আদালত আইন-২০১০, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০ এবং বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই এ সকল আইন ইতিবাচক ফল বয়ে এনেছে। আন্তর্জাতিক মহল থেকেও এসেছে স্বীকৃতি। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের জন্য জাতিসংঘের পলিসি লিডারশিপ শ্রেণিতে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ ২০১৫' পুরস্কারে ভূষিত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

স্মরণ

কামিনী রায় (জন্ম- ১২ই অক্টোবর- ১৮৬৪-২৭শে সেপ্টেম্বর-১৯৩৩) বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি। সংস্কৃত ভাষায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ১৮৮৬ সালে। এরপর শিক্ষকতা করেছেন। প্রথম কবিতার বই 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। ১৯০৫ সালে লেখেন শিশুদের জন্য কবিতাসমগ্র 'গুঞ্জন'।

'পাছে লোকে কিছু বলে'

করিতে পারি না কাজ
সদা ভয় সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

আড়ালে আড়ালে থাকি
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

কবি কামিনী রায়

রহিমা আক্তার মৌ

ছোট্ট বন্ধুরা, বলো তো এই সুন্দর কবিতাটি তোমরা এর আগে কে কে পড়েছ?

হ্যাঁ, তোমরা অনেকেই পড়েছ। উপদেশ দেওয়া এই কবিতাটি লিখেছেন আমাদের সবার প্রিয় কবি ও লেখক কামিনী রায়।

কবিরা লিখেন, মনের ভাব প্রকাশ করেন, উনাদের মনের ভাব আমাদের জন্যে আদেশ-উপদেশ। যা আমাদের চলার পথের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

কবি কামিনী রায় অনেক ধরনের কবিতা লিখেছেন। 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতাটি কবির উপদেশমূলক কবিতাগুলোর একটি। বন্ধুরা, আমাদের মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ এক সময় খুবই কম ছিল। যে সময় আমাদের বাঙালি মেয়েরা লোকালয়ে আসতে পারত না, সেসময় থেকে কামিনী রায় সাহিত্য রচনা করতেন। এটা আমাদের জন্যে অনেক আনন্দের খবর। মাত্র আট বছর বয়স থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন তিনি।

১৮৬৪ সালের ১২ই অক্টোবর বাকেরগঞ্জের বাসন্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম বাঙালি নারী স্নাতক ডিগ্রিধারী ব্যক্তি কামিনী রায়। তাঁর পিতার নাম চন্ডীচরণ সেন আর মায়ের নাম রামা সুন্দরী দেবী। বাবা ছিলেন একজন ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক আর পেশায় বিচারক। কবি কামিনী রায়-এর বোন যামিনী সেন ছিলেন তৎকালীন সময়ের প্রখ্যাত চিকিৎসক। তিনি নেপালের রাজ পরিবারের চিকিৎসক ছিলেন।

মায়ের সাথে রান্নাঘরে বসে বসে তালপাতায় বর্ণ লেখা শিখেছেন, পিতার লাইব্রেরিতে বসে বসে শিখেছেন গণিত শিক্ষা। গণিতে অনেকটা পটু হয়ে উঠেছিলেন শিশু কামিনী রায়। এই জন্যে গণিতের শিক্ষক তাঁর নাম দিয়েছিলেন লীলাবতী।

এখন আমরা অনেকেই ছোটো বয়সেই স্কুলে ভর্তি হয়ে যাই। কামিনী রায়ের সময় তা হয়নি। বাড়িতে শিশু

শিক্ষা শেষ করে ৯ বছর বয়সে তাকে স্কুলে ভর্তি করানো হয়। বারো বছর বয়সে তাকে হোস্টেলে পাঠানো হয়। তিনি ১৮৮০ সালে কলকাতা বেথুন ফিমেল স্কুল হতে এনট্রান্স (মাধ্যমিক) পাস করেন। ১৮৮৩ সালে আর্টস (উচ্চ মাধ্যমিক সমমানের) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। বেথুন কলেজ হতে তিনি ১৮৮৬ সালে ভারতের প্রথম নারী হিসেবে সংস্কৃত ভাষায় সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। স্নাতক পাস করার পরই অনেক জায়গা থেকে চাকরির সুযোগ আসে তাঁর। কিন্তু পিতা আপত্তি জানায় চাকরি করতে। পিতা খুব আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'অধিকাংশ ছেলে আজকাল চাকরি পাবার জন্য পড়াশোনা করেন। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নয়। কন্যাকে আমি কখনই চাকরি করিতে দিব না।'

প্রথমে রাজি না হলেও পরে অন্য অনেকের পরামর্শে কামিনীকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য চাকরি করতে দেন। তিনি বুঝতে পারেন লেখাপড়া করে চাকরি করলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ ভালো হয়। ১৮৮৬ সালে কামিনী 'বেথুন' কলেজেই পড়ানো শুরু করেন। দীর্ঘদিন তিনি এই কলেজে পড়ান। দুঃখী মানুষের সেবায় মানুষের পাশে থাকতেন সবসময়। মানবতাকে তিনি গুরুত্ব দিতেন, দরিদ্রদের পাশে থেকে তাদের যতটুকু সাধ্য সাহায্য সহযোগিতা করতেন সর্বদাই।

১৯২৩ সালে এক সম্মেলনে যোগ দিতে কামিনী রায় বরিশালে এসেছিলেন। তখন বাংলার আরেক মহিয়সী নারী সাহিত্যিক কবি সুফিয়া কামালের সাথে তাঁর দেখা হয়। কামিনী রায়ের কবিতার ভক্ত ছিলেন কেদারনাথ রায়, তাঁরই আগ্রহে ১৮৯৪ সালে কামিনী রায়ের সাথে বিয়ে হয় কেদারনাথ রায়ের। বিয়ের পরে কামিনী রায় তেমনভাবে কবিতা লিখেননি, সংসারের কাজ ও সন্তান পালন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তখন কেবল 'গুঞ্জন' নামে তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল।

'গুঞ্জন' কামিনী রায়ের শিশুতোষ কবিতার বই। তাঁর প্রকাশিত প্রথম কবিতার বই 'আলো ও ছায়া'। নীতির কথা, সহজ ভাষার কথা ও শিক্ষার কথাই ছিল তাঁর কবিতার কথাগুলো।

১৯৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি আমাদের সকলকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে যান।

শেষ বেলায় কবির আরেকটা কবিতা তোমাদের জন্যে। কবিতাটির নাম 'কত ভালবাসি'-

জড়ায়ে মায়ের গলা শিশু কহে আসি,-
'মা, তোমারে কত ভালোবাসি!'
'কত ভালবাস ধন?' জননী শুধায়।
'এ-ত।' বলি দুই হাত প্রসারি' দেখায়।

'তুমি মা আমারে ভালবাস কতখানি?'
মা বলেন 'মাপ তার আমি নাহি জানি।'
'তবু কতখানি, বল।'

'যতখানি ধরে
তোমার মায়ের বুকে।'
'নহে তার পরে?'

'তার বাড়া ভালবাসা পারি না বাসিতে।'
'আমি পারি।' বলে শিশু হাসিতে হাসিতে!

মা আমার মা

মো. মোক্তাদির হাসান

মা, তুমি আমার ন্যায়ের প্রতীক
স্বপ্ন লোকের ছায়া,
তোমার মাঝে পাই খুঁজে
অনন্ত সুখ মায়া।

তুমি আমার বন্ধু মাগো
সকল খেলার সাথি।
দুষ্টুমিতে ভয় দেখাতে
হাতে নাইতো লাঠি?

৭ম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল হাই
স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

বায়না

তাসনিম মাহদী

পাখি তুই আয়না
তোর কাছে বায়না।
তোর দুটি ডানাতে
ভর করে যাব যে
দূরের ঐ আকাশে।
যাবি নিয়ে বল না
তোকে দেবো খেলনা।
নীল নীল আকাশে
মেলে দিয়ে পাখা সে।
যাবি নিয়ে আয়না
তোর কাছে বায়না।

তৃতীয় শ্রেণি, শিশুমেলা
প্রিপারেটরি স্কুল

যা-তা

দিলরুবা পুষ্প

মিউ মিউ ডাকে নাতো বিড়ালের ছানা
চোখ আছে হরিণের তবুও সে কানা;
ছাগলের শিং নেই বড়ো দুই মাথা,
কামকাজ নাই বলে লিখে যাই যা-তা!

পিঁপড়ের চোখ দুটো ওমা! সে-কী বড়ো
চোখ দেখে হাতিমামা ভয়ে জড়োসড়ো!
রোদ পেয়ে পুঁটিমাছও হাতে নেয় ছাতা,
কামকাজ নাই বলে লিখে যাই যা-তা!

সুপারির গাছে ধরে বড়ো বড়ো কলা
ইশ্, কী যে হতবাক যায় মুখে বলা?
পাড়াময় হেঁটে গান করে গাছ পাতা,
কামকাজ নাই বলে লিখে যাই যা-তা!

বাদুড়ের ডিম দেখে ইঁদুরের হাসি
ডিম ফুটে ছানাগুলো দেয় জুড়ে কাশি;
আচানক! দেখে হ্যাং কুমিরের মাথা,
কামকাজ নাই বলে লিখে যাই যা-তা!

বাবা মানে কি

রায়হান হোসেন

বাবা মানে,
লাফ দিয়ে কোলে ওঠা,
আঙুল ধরে হাঁটতে শেখা।

বাবা মানে,
লাল-নীল বেলুন উড়িয়ে
জন্মদিনের কেক কাটা।

বাবা মানে,
প্রথম ক্রিকেট ব্যাট হাতে ধরা,

বাবা মানে, ফুটবলে প্রথম লাথি মারা,
রোনালদো, মেসি আর নেইমারকে চেনা।

তৃতীয় শ্রেণি, শেরে বাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

আয়নামতী ও নিতুর গল্প

দিলারা মেসবাহ

নিতু সাতসকালে আয়নামতীকে জড়িয়ে ধরে হেঁচকি তুলে তুলে কাঁদছে। আয়নামতী চাপা গলায় বলে, এই যে শুরু করলে আষাঢ় মাসের বৃষ্টি। সাতসকালে, হয়েছেটা কী বলবে তো? নাকি এমনি চলতে থাকবে। আমি বাপু কান্নাকাটি সইতে পারি না।

নিতু এবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কুঁচকানো ফ্রকটা টানটান করে। কান্না ভরা ভারি গলায় বলে, ঐ যে আমাদের বাড়িতে একটা পচা ভাই আছে না? খুব বাজে, একদম পচা। ও আমাকে মাথায় গাট্টা মেরেছে। কেন মারবে বলো? মারবে কেন? আমি কী ওর মতো পচা? আমি তো গুড গার্ল। ভালো একটা মেয়ে। তাই না বলো? মাকে বললাম মা পাত্তাই দিল না। যেন আমি ফালতু কথা বলছি। মা কিচেনে ঢুকে সিদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়াতে লাগলেন যেন কত জরুরি কাজ। বাবা খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে ভারি গলায় শুধু হু হু বললেন। বলো তুমি কোনো মানে হয়। এ বাড়িতে সব্বাই আমার শত্রু। কেবল তুমি আমার আসল বন্ধু। পুষি বিড়াল ছানাটা ছিল, কত খেলতাম ওর সাথে। মা বললেন, বিড়ালের এঁটো খাবার যদি কোনো রকমে পেটে যায়, তবে নাকি ডিপথেরিয়া হয়। বলো এসব ভালো লাগে? সুন্দর বিড়াল ছানাটাকে বস্তায় ভরে কোথায় যে পাঠিয়ে দিল। ওর কথা মনে হলে আমার ভীষণ কান্না পায়।

আয়নামতী ঝরঝরে গলায় বলল, মা তো ঠিকই বলেছেন। তোমাদের দুধের হাঁড়িতে পুষিটা মুখ দিত। বুয়া তো একটু আলসে। সেদিন তোমার মা এই কারবার দেখে বেজায় রাগ করেছেন। আলতা বুয়াকেও বকা দিয়েছেন। বুয়া গজগজ করছিল। এ ঘরে এসে একা একাই বকবক করছিল- চুন্নি বিলাইরে বাড়িত থেইকা খেদাইয়া দিলেই হয়।

নিতু এবার ভেজা গলায় বলে। একটু পরে পচা ভাইয়া স্কুলে যাবে। মা যাবেন অফিসে। বাবা তো চলেই গেছেন। আজ আমাদের ছুটি। আজ অনেক গল্প করব, অনেক কথা বলব, ঠিক আছে? পচা ভাইয়া সকাল থেকে আমার উপর মাতব্বরি করছে। খালি খালি মাতব্বরি।

আয়নামতী এবার ফিসফিস করে বলে, আসল ঘটনা কী? বলো দেখি শুনি।

নিতু তুলতুলে তোম্বা তোম্বা গাল ফুলিয়ে বলে, গ্লাসে পানি ঢালতে গিয়ে একটু পানি ছিটকে পড়েছে টেবিলে, সেই জন্য। এইটা কোনো কারণ

হলো? এত্ত জোরে মাথায় একটা গাট্টা মেরেছে, ফুলে গেছে, এই দেখো।

আয়নামতী মিষ্টি গলায় বলে, এত মন খারাপ কারো নাতো। বড়োরা একটু ছোটোদের শাসন করবেই।

নিতু অভিমানী গলায় বলে, শোনো বন্ধু! অংক আমি ভয় পাই। রবিবার দিন একটা যোগ অংকে একটু ভুল হয়েছে, অমনি চড় মেরে দিল। জানো কত যে দুঃখের কথা। মানুষের ভাইয়ারা কী এত পচা হয়।

বলতে বলতে আবার হেঁচকি তুলে কাঁদল নিতু। বড়ো বড়ো চোখের পাপড়ি পর্যন্ত ভেজা। টপটপ করে ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা লেবুর রস।

আয়নামতী কাঁদুনি মেয়েটাকে বুঝায়। বড়ো ভাইয়ারা একটু শাসন করবেই। ও যে তোমাকে অনেক ভালোবাসে। জানো কবিগুরু লিখেছেন, 'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে-গো।' বুঝলে না?

নিতু খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তারপর বলে- সোহাগ, সেটা আবার কী জিনিস?

আয়নামতী হেসে হেসে বলে, সোহাগ মানে আদর নিতু। জানো না তুমি?

নিতুর মন এখনো ভালো হয়নি। মুখ কালো করে বলে, কই কবে সোহাগ দেখালো? আমি তো বুঝিনি। পচা ভাইয়াটা আর রাগি রাগি আব্বু, আম্মু। তুমি আছো, তাই একটু ভালো আছি। তাই তো তোমার কাছে ছুটে আসি।'

এবার আয়নামতী খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে, ওরে বোকা মেয়ে গত সোমবার তোমার আট বছর পুরো হলো। জন্মদিনে মামনি, আব্বু, ভাইয়া সবাই মিলে তোমাকে সারপ্রাইজ দিলেন। তোমার বন্ধু, আত্মীয় কতজনকে চুপি চুপি নিমন্ত্রণ দিয়ে রেখেছিলেন। সবাই মিলে কত মজা হলো। রাতে তুমি ঘুমিয়ে গেলে ভাইয়া তোমার ঘর বেলুন, ফুল দিয়ে সাজালো। কত বড়ো কেক কাটা হলো। আলতা বুয়ার চার ছেলে-মেয়েকেও নতুন জামা দিলেন তোমার মামনি। ওরাও এসেছিল।

নিতু আমতা আমতা করে বলে, ধ্যাঁত সে তো জন্মদিন বলে।'

আহা সবারই কী এত সুন্দর করে জন্মদিন হয়? মিঠু ভাইয়া তো প্রায়ই তোমার জন্যে বাদাম নিয়ে আসে ঠোঙা ভরে। মা আনেন মৌসুমী ফলপাকুড়। নিজ হাতে ধুয়ে মুছে তোমাকে বাটি ভরে খাওয়ান। বাবা কত রং পেন্সিল, গল্পের বই কিনে দেন। চকোলেট দেন। এসব অমনি অমনি। ভালোবাসে বলেই তো।

নিতুর হাঁফ ধরে যায়। এত কথা। বাপরে বাপ। তবু আয়নামতীই তো তার একমাত্র বন্ধু। এগোরটায় স্কুল ছুটির পর নিরিবিলি বাড়িটা যেন তাকে গিলে খেতে চায়। নিতু যেন সোনার খাঁচায় বন্দি একটা ময়না পাখি। ময়নার মা তো পাকঘরে রান্না করে আর একা একা বকর বকর করে। টেবিলে ভাত, ডাল, মুরগি সাজিয়ে দিয়ে ডাবল পান জর্দা চিবুতে চিবুতে হাঁক ছাড়ে জোরছে, রান্দন বাড়ন শ্যাষ। খাইয়া লও জলদি জলদি। আরো ম্যালা কাম পইড়্যা রইছে।

নিতুর একা একা খেতে ইচ্ছে করে না। বাবা- মা, ভাইয়া ফিরবেন- বিকেল নাগাদ। এতটা সময় কেমন করে কাটে নিতুর। গাদা গাদা হোমওয়ার্ক করে। তারপর এ ঘর থেকে ও ঘর ঘুরে বেড়ানো।

কয়দিন আগেও থাই কাচের বড়ো জানালাটা খুললে মায়ের বাগান দেখা যেত। হলুদ, লাল রঙ্গন কুন্দ, বেলি, স্থলপদ্ম আরো কত ফুল। ঝিলপাড়ের বস্তি থেকে চান্দু, সুরমা, কইতুরি আসত। জানালার গ্রিল ধরে কত গল্প করত নিতু। মালি চাচু মাকে নালিশ দেবার পর ঐ জানালাটা খোলা নিষেধ হয়ে গেল। বড়োরা ঘরে ফিরলে ওটা খোলা হবে। বস্তির মেয়েগুলো নাকি খুব বিপজ্জনক। মেইন গেটে থাকে তালা। একটা চাবি থাকে মালি চাচুর হাতে।

নিতুর মাঝে মাঝে পাগল পাগল লাগে। ঠিক তখনই একমাত্র ভরসা আয়নামতী। কত গল্পই যে হয় ওর সাথে। যত দুঃখ আছে নিতুর ছোট্ট মনের মধ্যে সব উজাড় করে বলে আয়নামতীকে।

কিছুক্ষণ আগে ফোন এসেছে মায়ের। কী আনন্দ! কী আনন্দ। নিতু প্রিয় বন্ধু আয়নামতীকে জড়িয়ে ধরে বলে, আয়নামতী মা ১৫ দিন ছুটি নিয়েছেন অফিস থেকে। আমরা কুয়াকাটা যাব। বিছানাকান্দি যাব, পাহাড়পুরে যাব। কী মজাই না হবে। বলতে বলতে আয়নামতীকে জাপটে ধরে। আরো জোরে।

আয়নামতী ককিয়ে ওঠে, উহ ব্যথা পাচ্ছি নিতু। বলতে বলতে পুরনো নকশাদার কাঠের ফ্রেম থেকে ঝন ঝন করে ঝরে পড়ে আয়নামতী। টুকরো-টুকরো। শত টুকরো। কত বছরের বেলজিয়াম কাচ। দাদিমার আমলের প্রিয় আরশি।

খুকি

শারমিন সুলতানা রীনা

রঙিন রঙিন পুঁতি দিয়ে
গড়ছে খুকি মালা
তাই দিয়ে আজ সাজাবে সে
পুতুল খেলার ডালা।

মা রেগে কয় ওরে খুকি
লেখাপড়া করো
পড়ালেখা না করে কী
কেউ হয়েছে বড়ো?

খুকি বলে শোনো না মা
সারাটা দিন পড়ি
একটুখানি অবসরে
বলো না কী করি?

মার বকুনি খেয়ে খুকি
হয় যে অভিমানি
আদর করে মা তাকে নেয়
বুকের মাঝে টানি।

রক্তে ভেজা মাটি

করুণা আচার্য

বাংলার মাটি রক্তে ভেজা, অখণ্ড এক মাটি,
বাংলার মাটি সোনার প্রলেপ, খাঁটির চেয়েও খাঁটি।
বাংলার মাটি অনন্ত প্রেম, অপার সুখের ঘাটি,
বাংলার মাটি পূণ্য ভূমি, জন্মে সোনালি আঁটি।

বাংলার মাটি মুক্তিযোদ্ধার সহস্র ঐক্য লাঠি,
বাংলার মাটি ধনে ধ্যানে, পুষ্পে পরিপাটি।

বাংলার মাটি সাম্যের প্রতীক, স্বপ্নে মাখানো ঘ্রাণ
বাংলার মাটি বীর বাঙালির শীতল করেছে প্রাণ।

বাংলার মাটি ইতিহাস গড়া, রক্তে রাঙানো নদী,
বাংলার মাটি প্রেরণার মাটি, বুকে টানে নিরবধি।

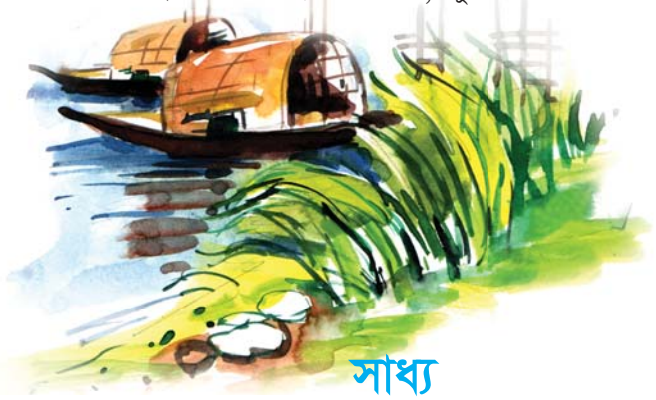

বাংলাদেশের মেধা

শফিক ইমতিয়াজ

বাংলাদেশের মেধা আমি নদীর মতো মন
গানের মাটি মেখে গায়ে পেরোই পাহাড় বন
সাগর নদী আকাশ পথে ছুটছি অফুরান
স্বপ্ন পলির শীতল মাঠে নাচে দূরের ধান।

ভাঙা ভিটে, ভাঙা জমি, হাজার ভাঙা বুক
আমার মনের নকশিকাঁথায় সব স্বজনের মুখ
জলের স্রোতে আগলে রাখি লক্ষ চোখের জল
চলার পথের ছন্দ আমার ছলাৎ ছলাৎ ছল।

এই পৃথিবীর যেখানে যাই ফোটাই গোলাপ ফুল
মায়ের আঙুল ছুঁয়ে আছে রাঙা মাথার চুল।

সাধ্য

মাহফুজা আক্তার মুন্নি

আমার কী সাধ্য আছে তোদের ছোঁয়ার!
ঐ আকাশে দূরে বহু দূরে
যেখানে সাদা মেঘের ভেলা হেসে বেড়ায়
আমার কী সাধ্য আছে তোদের ছোঁয়ার!
দূরে বহু দূরে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
সাত সমুদ্রের তল খুঁজে তুলে এনেছি কত মুক্তামণি
কিন্তু নাগাল পাইনি তোদের
আমার কী সাধ্য আছে তোদের ছোঁয়ার!
তোদের সাথে তাল মিলিয়ে
পথ চলার তাল পাইনি আমি
তোরা না হয় পথ এগিয়ে চলিস
আমি না হয় তোদের পিছে থাকি।

টিকটিকির লেজ!!
আজব কিন্তু গুজব না

অর্ক রায় সেতু

আমার ছোটো বোন দোয়েল ক্লাস থ্রিতে পড়ে। বড়ো দুষ্ট, তাকে সবসময় বলি পোকামাকড় নিয়ে মজা তামাশা করলেই ডারউইন হওয়া যায় না। সে কি আর কারো কথা শুনে? দেয়ালে টিকটিকি দেখলে ধপাস করে বসে পড়ে। আর অমনি সেই টিকটিকিটা লেজ খসিয়ে পালিয়ে যায়। দোয়েল তো তখন হা! কেঁদে ওঠে, বলে ভ্যাঁ!!!

মানুষের শরীরের কোষগুলো যখন কেটে যায় অনেক রক্ত বেরোয়। কিন্তু টিকটিকির লেজ তার শরীর থেকে আলাদা হওয়ার পরেও রক্ত বের হয় না, আবার টিকটিকি লেজ খসিয়ে পালিয়ে যায় বিষয়টা কেমন বিদঘুটে।

বিজ্ঞানবিদরা মনে করেন, টিকটিকি আত্মরক্ষার জন্য এই কাজটা করে থাকে অর্থাৎ লেজ খসিয়ে পালিয়ে যায়। আবার এর আরেকটা কারণ হতে পারে। টিকটিকির লেজ নরম হাড় দিয়ে তৈরি। লেজের কিছুটা মাঝ বরাবর একটা ফাটা কোষ থাকায় বিপদ বুঝে এরা লেজ খসিয়ে পালিয়ে যেতে পারে খুব সহজে।

তবে এ কেমন কথা লেজটা সামনে পরে নাচতে থাকল অথচ একটুও রক্ত বের হলো না! টিকটিকির কেন এমন হয়?

যখন টিকটিকি তার লেজ খসায় আগে থেকে সে অংশে রক্ত পৌঁছানো বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে আমরা টিকটিকির খসে পরা লেজে কোনো রক্ত লেগে থাকতে দেখি না বা সে অংশ থেকে রক্ত বের হয় না।

সুমন্ত বর্মণ-এর মজার ছড়া

উন্নতি

ভোলানাথ লিখেছিল তিন-চারে কত?
নব্বই (গণিতে সে ভালো নয় অত)!
তার ছেলে কাশীনাথ ইশকুলে পড়ে
গণিতের জ্ঞান তারও বড়ো নড়বড়ে!

নামতার নাম নিলে আসে তার জ্বর
আজেবাজে দিয়ে নাকি ভরা দশ ঘর!
চার-ছয় চব্বিশ, চার-পাঁচে কুড়ি
দেখলেই মাথা তার করে ঘোরাঘুরি!
কতবার পড়েছে সে, আসেনি তা বাগে
নামতার পাতা তাই ছিঁড়েছে সে রাগে!

একদিন কাশী লেখে তিন-চারে আশি
এই নিয়ে ক্লাস জুড়ে সে কী হাসাহাসি!
গণিতে সে কাঁচা, তবে পেয়েছিল টের
তিন-চারে আশি লেখা হয়েছিল ঢের!
আশিকে সে কেটে তাই লিখে দিল ষাট
ভেবেছিল এইবার পাবে আটে আট।
আট নয়, গোল্লাটা হয়েছিল খেতে!
বুঝেছিল আরো বেশি আছে কিছু এতে।
তাই আরো কমিয়ে সে চল্লিশ করে,
তবু স্যার ফলটাকে সঠিক না ধরে।
চল্লিশ কেটে শেষে কুড়ি করে কাশী
তিন-চারে কুড়ি দেখে ফের হাসাহাসি।

পরদিন স্যার কন ভোলানাথে ডেকে,
আপনার কাশীনাথ কী যে সব লেখে!
তিন-চারে আশি লিখে কেটে করে ষাট,
ষাট কেটে চল্লিশ, দেখুন সে পাঠ।
চল্লিশে থেমেছে কী? থামে অবশেষে
কাটাকাটি করে করে কুড়িতে সে এসে।
তিন-চারে কত হয় অজানা কি কারো?
এতদিনে জানে ভোলা তিন-চারে বারো।

তবু তার মুখে হাসি দিয়ে গেল দোলা
ফুরফুরে মন নিয়ে বলে যায় ভোলা
কেউ-কেউ উন্নতি করে খেটে খেটে
কাশীনাথ করেছে তা শুধু কেটে কেটে!
খুব বড়ো ব্যবধান বারো আর আশি
ধাপে ধাপে সেইটাই কমিয়েছে কাশী
এখন তো ব্যবধান সামান্য অতি,
আশি থেকে বিশে আসা বেশ উন্নতি!

ওরে ভোলা, ব্যবধান হলে একচুল
নামতার নীতিতে তা খুব বড়ো ভুল।

গল্প

পটলের হারিয়ে যাওয়া

দীলতাজ রহমান

গাঁয়ের এক গরিব লোক। তার অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে। সবচেয়ে ছোটোটির নাম পটল।

পটল নাম মানে, তাকে তার বড়ো ভাইবোনেরা আদর করে পটল ডাকে। আর তাই সে পটল নামেই বড়ো হচ্ছে।

পটলের মায়ের এক বড়ো বোন অনেক বড়োলোক। মায়ের সেই বড়োলোক বোন সম্পর্কে কখনো কিছু বলতে হলে, পটলের ভাইবোনেরা তাকে বড়োলোক খালা বলে কথা বলে।

একবার পটলের মায়ের খুব ইচ্ছে হলো সে সেই বড়োলোক বোনের বাড়ি বেড়াতে যাবে। কিন্তু একসাথে এতগুলো ছেলে-মেয়ে নিয়ে তো আর শহরে কারো বাড়ি যাওয়া যায় না। শেষে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, একা পটলকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কিন্তু মাঝরাতে ঘুম ভেঙে পটলের মা একে একে সব ছেলে-মেয়েকে জাগিয়ে তুলল। বলল, একা পটলকে নিয়ে যে যাবো, আমি তো পথ চিনি না। জীবনেও একা একা কোথাও যাইনি। ধারেকাছে বাপের বাড়ি তাই তোদের বাপ দিয়ে আসে আবার নিয়ে আসে। তাছাড়া আমার কাপড়ের পোটলাটা বয়ে নেবে কে?

ভাইবোনদের কেউ একজন বলল, মা তোমার পুরনো কাপড় বয়ে নিতে হবে না। খালা তোমাকে নতুন কাপড় কিনে দেবেন। কারণ অত বড়োলোকের বাড়িতে তোমাকে এসব কাপড় তারা কেউ পরতে দেবেন না।

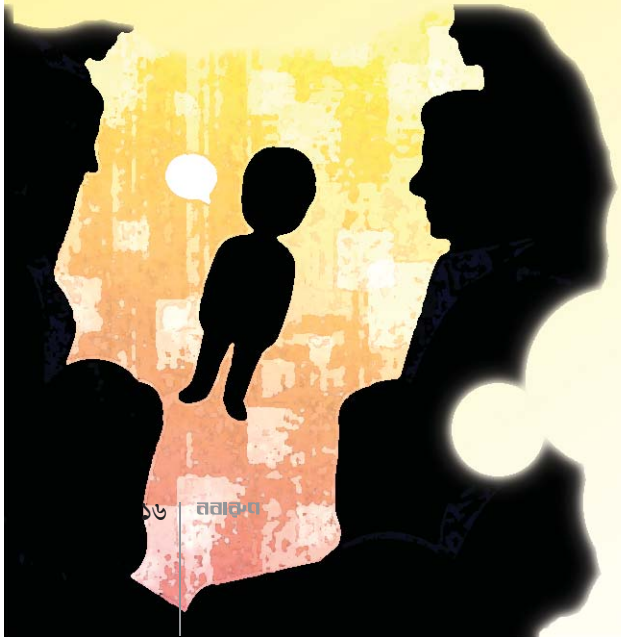

পটলের মা বলল, সে না হয় হলো। কিন্তু ওদের জন্য তো কিছু পিঠা, ফল, পুকুর থেকে জিয়ল মাছ নিয়ে যেতে হবে।

শেষে পটলের বাবা বলল, ঠিক আছে, হাবিল যাবে তোমার সাথে।

হাবিল পটলদের সব ভাইবোনের বড়ো। বাবার কথা শুনে বড়ো ভাই বলল, ঠিক আছে মা, লেখা ঠিকানা মতো আমি তোমাকে নিয়ে যাব। কিন্তু যাবে যে, খালাকে আগে থেকে ফোনে জানিয়েছ তো?

মা বললেন, কতবার যাই যাই করে যাওয়া হয়নি। তাই রওনা দেওয়ার আগে জানাব।

পরদিন খুব সকালে পটলরা বরিশাল থেকে রওনা হলো। চার বছরের পটল মাঝে মাঝে গাঁয়ের রাস্তায় এক আধটু রিকশায় উঠলেও এই প্রথম বাসে চড়ল। তারপর লঞ্চে উঠল। নদীর বুকে ভেসে ঢেউয়ের তালে দুলে সে অনেক আনন্দ পেল। সব থেকে অবাক হলো সে খালার বাসায় লিফটে উঠে যখন পাঁচতলায় নামল, বড়ো ভাই কলিং বেলে চাপ দিলে বুয়া দরজা খুলে দিলো।

বাসার ভিতর ঢুকেই পটল খালি এ বারান্দা সে বারান্দায় ছুটোছুটি করতে লাগল। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে নিচে তাকানোর তার সে কি চেষ্টা। পটল অবাক হয়েছে সিঁড়ি না বেয়েও কীভাবে এত উপরে এলাম ভেবে। মা তাই খালাকে প্রশ্ন করে, বুবু এইটা কয়তলা দালান?

পটলের খালা বলেন, এই দালানটা পনেরো তলা। আমরা যেখানে আছি, এটা পাঁচতলা। আমাদের মাথার ওপরে আরো দশতলা আছে। দেখো, দরজা খোলা পেয়ে কখনো তোমার ছোটো ছেলেটি যেন বাইরে না যায়। এখানে সবগুলো দরজা দেখতে একই রকম। শেষে গোলকধাঁধায় পড়ে যাবে। আর লিফটে ঢুকে গেলে তো আরো বিপদ হয়ে যাবে।

পটলের খালার কথা শুনে পটলের মা তো আঁতকে উঠল। বলল, বলেন কী বুবু? আমার তো পটলকে নিয়ে চিন্তায় কলিজা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে কবার এদিক-ওদিক হারিয়ে গেছে। পানিতে পড়েছে। ও হাবিল, যে কয়দিন এই বাসায় থাকি, আমার সাথে তুইও ওরে একটু পাহারা দিয়ে রাখিস বাজান।

হাবিল বলল, আমিও তো কোনোদিন ঢাকায় আসিনি মা। আমি ঘুরে ঘুরে জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার এগুলো দেখতে চাই। বন্ধুদের কাছে এগুলোর অনেক গল্প শুনেছি।

হাবিলের কথা শুনে খালা বললেন তা তুই যখন যাচ্ছিস, তোর মা আর ভাইকেও নিয়ে যা! ঢাকা শহরে যা জ্যাম, আমাদের তো কারো এত সময় নেই যে তোদেরকে নিয়ে ঘুরব। সবাই ব্যস্ত। যদিও আমি তোদের জন্যই অফিস থেকে কয়দিন ছুটি নিয়েছি।

হাবিল বলল, তাহলে খালা আগে আমি চিনে আসি, তারপর মা আর পটলকে নিয়ে সবখানে দেখিয়ে আনব?

খালা বললেন, হ্যাঁ, সেই ভালো। আমি তোদেরকে কিছু টাকা দেবো। তোরা দেখেশুনে নিজেরাই তোদের জন্য এবং বাড়িতে তোদের যারা আছে, তাদের সবার জন্য জামাকাপড় কিনিস।

খালার কথায় হাবিল খুব খুশি হলো। অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে। তাই সবার জন্য একসাথে জামাকাপড় কেনা হয় ন। ওর মা খুশিতে কাঁদো কাঁদো অবস্থা। আর ঠিক তখনি পটলের দিকে ইশারা করে খালা জানতে চান, তা হ্যাঁরে, ওকে তোরা পটল বলে ডাকিস কেন? পটল তো একটা তরকারির নাম।

পটলের মা বলল, সবাই আদর করে পটল ডাকে।

খালা বললেন, আদর করে ডাকার নাম কি দুনিয়ায় আর নেই?

পটলের মা বলল, তাহলে আপনি ওর একটা নাম রাখেন বুবু। আপনি অনেক লেখাপড়া করেছেন। আবার চাকরিও করেন। দেশে যান না দেখে আমার ছেলে-মেয়েরা আপনারে দেখে না। পটলের নামটা আপনি পালটে দিয়েছেন শুনলে সবাই খুশি হবে।

খালা বললেন, আচ্ছা, ভাবতে থাকি।

পটলের বড়ো ভাই জাদুঘরে ঘুরে ঘুরে সারাদিন সব আশ্চর্য জিনিস দেখে, আর ভাবে, কালই মা আর পটলকে নিয়ে আসব। তারপর একে একে সুযোগমতো মতি, আমেনা, কামাল, হাবিব, সখিনা, পাপলু সবগুলো ভাইবোনকে এনে দেখাব। আর পরশুই যাব চিড়িয়াখানায়। এ সপ্তাহই বাড়ি ফিরতে হবে। কলেজ বেশি কামাই করলে খুব ক্ষতি হবে, ভাবতে ভাবতে খালার বাসায় পৌঁছেই সে মায়ের হাউমাউ কান্না শুনতে পেল। হাবিল বাসা থেকে বের হওয়ার পরপর কাজের লোকেরা কে কোন দরকারে দরজা খুলেছে, আর সেই ফাঁকে পটল বেরিয়ে গেছে।

পনেরো তলার উপরে ছাদ। ছাদের চারপাশে উঁচু করে শক্ত গ্রিল দেওয়া। সেখানে নেই পটল। প্রথমে ইন্টারকমে নিচে রিসিপশনে খালা খবর নিয়েছে। কেয়ারটেকাররা কেউ বেরিয়ে যেতে দেখেনি গ্রাম থেকে আসা চার বছরের শ্যামলা বরণ পটলকে।

হাবিল এত দুঃখের ভেতরও খেয়াল করছে, খালা পটলের খোঁজখবর করতে সবার কাছে কেমন পটল পটল করছে। এমনকি পুলিশের কাছেও বলছে পটল। এখন পটল নামটি একবারও তার মুখে আটকাচ্ছে না। অথচ দু-দিনে খালা একবারও তাকে নাম ধরে ডাকেননি, নামটি শুধু পটল বলে।

একটা বাচ্চা হাওয়া হয়ে যেতে পারে না। তাহলে কী হলো? খালা-খালু এবং খালার দুজন ছেলে-মেয়ের একই কথা। পটলের মা অবশ্য কেঁদেকেটে বলছে, আপনার সাথে ঘুরে ঘুরে দেখলাম তো। এইখান থেকে হারানোর কোনো পথ নাই বুবু। তাহলে পটলরে জিন ভূতে নিয়া গেল নাকি? গ্রামে এরকম হয় বুবু। কারণ, ছাদে যদি সে গিয়েও থাকে, পড়ার তো কোনো অবস্থা নাই? নিচে নেমে গেলেও গেটের বাইরে যেতে হলে এতগুলো দারোয়ানের কেউ দেখত না?

খবরটা পটলদের বাড়িতেও পৌঁছে গেছে। সেখানেও সবার কান্নাকাটি চলছে। একশটা ফ্ল্যাটের সব কটাতে খালা আর খালার দুই ছেলে-মেয়ে গিয়ে গিয়ে খোঁজ নেওয়াতে সেখানকার সব মানুষ জেনে গেছে, পাঁচতলার একটা ফ্ল্যাটে খালার বাড়িতে বেড়াতে আসা একটা ছোট্ট ছেলে হারিয়ে গেছে। তাই সবাই সবার ছেলে-মেয়ে নিয়ে আরো সতর্ক হয়ে পড়েছে। দারোয়ানগুলো আগের চেয়ে মালিকদের কাছে ধমকও খাচ্ছে বেশি।

এই রকম অবস্থার ভেতর প্রায় এক সপ্তাহ পর, রিসিপশন থেকে ইন্টারকমে একজন বলল, নিচে একটা ছোট্ট ছেলে একা একা ঘোরাঘুরি করছে। আপনারা কেউ এসে দেখেন তো...।

কথা শেষ হওয়ার আগেই পটলের খালা ঠাস করে রিসিভার রেখে দৌড়ে নিচে নেমে গেলেন। লিফটের কথা ভুলে গেছেন তিনি। সিঁড়ি দিয়ে বোনকে নামতে দেখে, নতুন বিপদের কথা ভাবতে থাকে পটলের মা। পটলের মা গুনগুনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে খোলা দরজায় লম্বা ঘোমটা মাথায় দাঁড়িয়ে থাকল। বোনের অপেক্ষায় সে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু খালা বেরোলো লিফট থেকে। সঙ্গে পটল।

পটলের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ থাকলেও চেহারাটা একবারে ভদ্র লাগছে। শেখানো, যত্ন করে পোষা বাচ্চারা যেমন থাকে। পটলের মা পটলের অবস্থা দেখে কাঁদতে ভুলে গেছে। সে ভয় কণ্ঠে বোনকে বলল, কইছিলাম না বুবু, পটলরে জিনে নিছে। দেখেন, ওর গায়ে কী দামি জামাকাপড়। পায়ে দামি জুতা। আপনারা আতরের সুবাস পাইতেছেন? কয়দিনে ফল-ফ্রুট খাওয়াইয়া কেমন মোটা তাজা করছে। চোখে কাজল। আবার নজর টিপও দিছে। ও বাজান, তোমারে কোনখানে আইনা ছাইড়া দিল?

পটলের খালা পটলের মাকে ধমক দিয়ে বললেন, থামবি তুই। পটলের সাথে আমাকে কথা বলতে দে।

হাবিল বলল, খালা, বাড়িতে বাবার কাছে ফোনে খবরটা বলি, পটলরে যে পাওয়া গেছে। পরে বিস্তারিত বলব?

খালা বললেন, শুধু বাবাকে কেন? সবাইকে বল। সবার আগে তোর খালুকে খবরটা দে। তার বাসা থেকে হারিয়েছিল, চিন্তা তো তারই বেশি।

খালা পটলকে কোলের কাছে নিয়ে জানতে চাইলেন, আচ্ছ সোনা বলো তো কে তোমাকে ধরে নিয়ে গেছিল?

পটল বুক ফুলিয়ে বলল, কেও আমারে নেয় নাই। ইশারায় লিফট দেখিয়ে বলল, আমি একলা ওইটার ভিতর ঢুইকা আঙুল দিয়া একটা চাপ দিছিলাম।

খালা বললেন, তারপর?

পটল বলল, তারপর ওইটা যখন খুলল, বাইর অইয়া আমি ভয় পাইয়া কানতেছিলাম।

খালা বললেন, তারপর?

পটল বলল, তারপর পরির মতো সোন্দর এক বেটি দরজা খুইলা আমারে দেখল। তারপর কোলে নিয়া ঘরে গিয়া দরজা বন্দ কইরা দিল। আপনেরা আমারে খুঁজতে গেলে পরি বেটি আমারে বারান্দায় লুকাইয়া তারপর দরজা খুলছিল।

খালা বললেন, আমি তোমাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম, তোমাকে কে বলল?

পটল বলল, আমি আপনার কথা শুনতে পাইছিলাম। মার কান্দন শুনতে পাইছিলাম।

খালা বললেন, তাহলে বারান্দা থেকে দৌড়ে আমাদের কাছে চলে আসোনি কেন?

পটল বলল, পরি বেটিগো শয়তান কাজের বেটিটা আমারে জাপটাইয়া ধইরা রাখছিল। মুখটা হাত দিয়া চাইপা রাখছিল। এরপর আর কোনোদিন দরজা খোলা পাই নাই।

খালা বললেন, তুমি কোন বাটনে চাপ দিয়েছিলে, আমাকে এখন দেখাতে পারবে?

পটল বলল, পারব।

খালা পটলকে লিফটের ভেতর নিয়ে গেলে, পটল পনেরো তলার বাটন দেখাল। কোন ফ্ল্যাটে ছিল তার দরজাও দেখাল। ওই বাসায় যারা থাকে তাদের ছেলে-মেয়ে নেই। তাই সবাই বিশ্বাস করল। সবাই পরামর্শ করল, পুলিশের কাছে ওদের ধরিয়ে না দিলেই নয়। পটলকে ঘরে আটকে রেখে মহিলা অপরাধ করেছিল। কিন্তু পুরুষটা কেন ওকে ফিরিয়ে দেয়নি? এমনকি তাদের কাজের লোকটিরও শাস্তি হওয়া দরকার। কেউ কেউ তাদেরকে খুঁজতে গিয়ে বুঝল, ওরা কেউই বাসায় নেই। দরজা খোলা পেয়ে পটল বেরিয়ে আসার পরই ওরা ভয় পেয়ে পালিয়েছে।

পড়শিরা কেউ কেউ ওদের পক্ষ নিয়ে খালাকে বলছে, মাফ করে দেন। পুলিশে ধরিয়ে দিলে ওদের অনেক বছরের জেল হবে।

কথাটা শুনে পটলের মা বলল, হ্যাঁ বুবু, আমি এই কদিন কষ্ট পেয়েছি ঠিকই। ওদের নিজের ছেলে-মেয়ে নেই বলে বোঝেনি, দুনিয়ার কোনো কিছু দিয়ে পরের ছেলে-মেয়ে আটকে রাখা যায় না। এই যে পটলরে আমি এখনো একটা নতুন জামা কিনে দিতে পারিনি, ওর বড়োজনের পুরনো জামা পরে। সেই পটল এত কিছু পেয়েও থাকল ওদের কাছে?

খালা বললেন, পুলিশকে পটলের হারানোর কথা জানানো হয়েছে। এখন কীভাবে পেলাম তাও জানাতে হবে। এতে যদি কেউ ফেঁসে যায়, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। আমাদের কিছু করার নাই।

পটলের মা বলল, শাস্তি পাওয়া থেকে ওদের বাঁচানো যায় কীভাবে, আপনি সেই পথ খোঁজেন। আর আমারে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

খালা অবাক হয়ে বললেন, বলিস কী? তোর তো কাঁদতে কাঁদতে এক সপ্তাহ চলে গেল। বেড়ানো হলো কোথাও?

পটলের মা বলল, আপনারে দেখা তো হলো।

পরদিন পটল আর মাকে নিয়ে হাবিল অনেক কেনাকাটা করল। খালার মেয়ে রুবি আপা দু'জনের জন্য ছোটো ছোটো দু'খানা ব্যাট আর একটা বল দিয়ে পটলকে বলল, তোমাকে একা একটা ব্যাট দিলে খেলবে কার সাথে? তাই তো দুজনের জন্য দু'খানা কিনেছি। একটা তোমার জন্য। আরেকটা তোমার বড়ো ভাই বেগুনের জন্য।

রুবি আপার কথায় পটল খুব মজা পেল। বলল, ইস আমার বড়োটার নাম তো পাপলু।

সিফাত ভাইয়া বলল, না, তা হবে না। পটলের ভাই বেগুন।

তারপর রুবি আপাকে সিফাত ভাইয়া বলল, আপু আমার ছোটোবেলার যা খেলনা আছে, সব দিয়ে দাও। মুলো, ঝিঙে, বরবটি, ধুন্দুল, কাচকলা, কাঁচামরিচ। সিফাত ভাইয়াকে থামাতে পটল চিৎকার করে হাবিলকে ডাকে, বড়োভাই তাড়াতাড়ি আসো, সবাইরে তরকারি বানাইয়া দিলো।

চিৎকার শুনে খালা ছুটে এসে নিজের বড়ো বড়ো ছেলে-মেয়ে দু'টিকে ধমক দিলেন, বললেন, ওইটুকু একটা বাচ্চাকে খেপাচ্ছিস ? কী ধকল গেল ওর ওপর দিয়ে চিন্তা করে দেখ।

পরদিন সকালে পটলরা চলে যাচ্ছে। একসাথে সবাই দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু পটল দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর মা বলল, কী হলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

পটল তবু তেমনি ভাব করে থাকল। হাবিল বলল, তাহলে মা ওকে আমরা রেখে যাই। ও আবার হারিয়ে যাক।

পটল তবু নড়ল না। খালা অবাক হলে বললেন, তোর যেতে ইচ্ছে করছে না, আমার কাছে থেকে যাবি?

এবার পটল অভিমানে গাল ফুলিয়ে খালাকে বলল, আপনি আমার তরকারি নাম পালটাইয়া দিবেন কইছিলেন।

পটলের কথা শুনে সবাই একসাথে হেসে ওঠে। হাসি থেমে গেলে খালা বললেন, থাক, তোমার আর নাম পালটে কাজ নেই বাপু। কারণ তোমার এই নামটি এখন পুলিশের খাতায়ও ঝুলে গেছে।

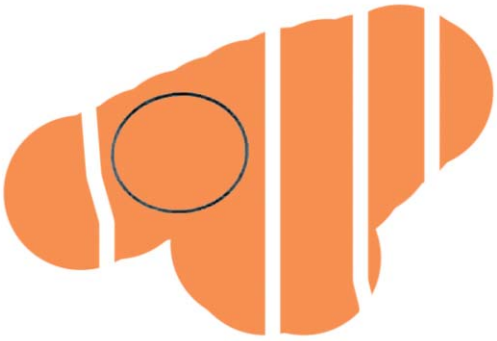

তিনটি কোয়েলের গল্প

মাহমুদা সুলতানা

খুব ভোরবেলায় ওরা আসে। প্রতিদিন আসে। এক ঝাঁক চড়ুই পাখি। গ্রিলে এসে বসে। গাছপালা তো তেমন নেই। গ্রিলের ফাঁকে ফাঁকে ওরা বেশ আনন্দিত হয়েই বসে। আমার অন্তত তেমনই মনে হয়।

জটলা করে। ওদের কিচিরমিচির শব্দে দারুণ একটা ছন্দময় আমেজের সৃষ্টি হয়। এমন একটা অপূর্ব দৃশ্য বিন্নিরা দেখতে পায় না। ওরা তখন গভীর ঘুমে। বিন্দি বলেছে, দাদু আমাদের ডাকো না কেন? বিন্তি বলেছে, কাল কিন্তু আমাদের ডাকবে। কিন্তু ডাকা হয় না। ওদের ঘুমন্ত নিষ্পাপ মুখ দেখে ডাকতে ইচ্ছে করে না। মায়া হয়। বিন্নিরা খুব রাগ করে। একটু বেলা হলেই ওরা চলে যায়। দু-চারটা পাখি থাকে। বিন্নি বিন্দি বিন্তি ঘুম থেকে উঠে ওদের দেখে। ওদের মন ভরে না।

একদিন বিন্নি বলে, দাদু তিনটা পাখি ধরতে পারো না? অবাক হয়ে বলি, কেমন করে? বিন্দি বলে, কেন খাঁচার ভেতর বাটিতে করে ভাত রেখে দিও। ওরা খেতে এলেই ধরে ফেলবে। বিন্তি বলে, দাদু আমাদের তিনটা পাখি হলেই চলবে। আমি বলি, ওভাবে ধরা যাবে না। ওরা খুব দ্রুত উড়ে যায়। বিন্দি বলে, একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়। বিন্নি বিন্তি সমস্বরে বলে, বলো না বিন্দি তোমার আইডিয়া। বিন্দি বেশ বিশ্বাসের সঙ্গে বলে, অনেক বড়ো একটা খাঁচা কিনে আনবে। খাবার দিয়ে খাঁচাটা বারান্দায় রেখে দেবে। খাবারের লোভে ওরা খাঁচায় ঢুকবে। তখন তুমি তাড়াতাড়ি খাঁচার মুখটা বন্ধ করে দেবে। দাদু মাত্র তিনটা পাখি হলেই আমাদের চলবে। চিন্তিত মুখে বলি, কিন্তু বনের পাখি এভাবে ধরা ঠিক না। ওরা ভারি কষ্ট পাবে। বন্দি জীবন ওদের একেবারেই পছন্দ নয়। বিন্নিরা যুক্তি দাঁড় করায়–দাদু আমরা পাখির সঙ্গে দু-চার দিন খেলেই ওদের আকাশে উড়িয়ে দেবো। ওরা একটুও কষ্ট পাবে না।

সেই থেকেই পাখির গল্পের শুরু। ওরা আমাকে রোজই বলে, দাদু তাহলে অন্য কোনো পাখি এনো। খাঁচার পাখি এনো। আমি জানি, খাঁচার পাখি কিছুদিন রাখা যাবে। ওরা খাঁচার ভেতরই বেড়ে ওঠে। কষ্ট যে পায় না তা বলব না। তবে মনে হয় একটু কম কষ্ট পায়। পাখি খুঁজি। শ্যামলীর মোড়ে কয়েকজন পাখিওয়ালা আসে প্রায়ই। শ্যামলীতে গিয়ে একদিন পাখি পেয়ে গেলাম। অন্য পাখিও ছিল। তবে একটা খাঁচায় ছিল তিনটা কোয়েল পাখি।

কোয়েল পাখির গল্পের শুরু এখান থেকে। পাখিওয়ালা বলে, নিয়ে যান। ডিমও পাড়বে, বাচ্চারা মজা পাবে। খাঁচায় করে তিনটা পাখি এল। বিন্নিরা তখন স্কুলে ছিল। স্কুল থেকে এসে দারুণ হইচই আর লাফালাফি শুরু করে দিল। খাঁচার ভেতরই একপাশে পানির পাত্র আর খাবারের পাত্র রাখা। ওদের হাজারো প্রশ্নে আমি অবাক। এখন ওদের ধ্যানজ্ঞান এই তিনটা কোয়েল। ঘুম থেকে এখন ওরা সকালেই উঠে পড়ে। খাবার দেয়, পাত্রে পানি

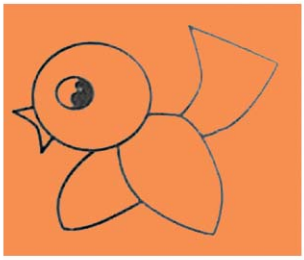

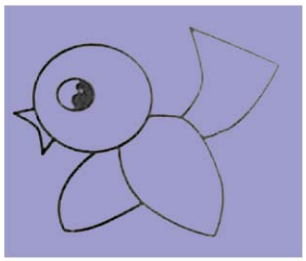

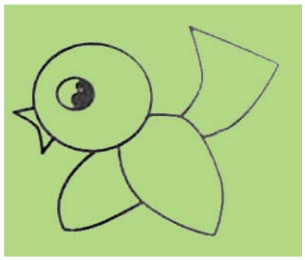

ভরে দেয়। বলে, দাদু বেশি করে পানি দিতে হবে। অনেক গরম পড়েছে। স্কুল থেকে ফিরেও সেই পাখির গল্প। দারুণ বিস্ময়ে ওরা পাখির গতিবিধি লক্ষ্য করে। অনেক কিছুই আবিষ্কার করে ওরা। পাখিরা কেমন করে তাকায়, ওরা কী বলতে চায়–সব ওদের মুখস্থ।

কাজের ফাঁকে একদিন দেখি, বারান্দা থেকে খাঁচাটা ওরা ওদের পড়ার ঘরে নিয়ে এসেছে। শুধু তাই নয়। তিনজনের হাতে তিনটি পাখি। দেখে মনে হলো ওরা যেমন আনন্দিত, পাখিরাও কম আনন্দিত নয়। আমি চমকে উঠে বলি, পাখিরা তো উড়ে যাবে। ওরা হাসে, না দাদু উড়ে যাবে না। দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। তাছাড়া পাখিরা আমাদের এখন চেনে। ওরা আমাদের বন্ধু।

বন্ধুদের নিয়ে দিন ভালোই কাটছিল বিন্নিদের।

কিন্তু কপাল খারাপ। একদিন সকালে উঠে দেখি, একটা পাখি মরে পড়ে আছে। দারুণ কষ্টে মনটা হু হু করে উঠল। বিন্নিদের কথা ভেবে ভয় পেলাম।

আমার ধারণাই ঠিক হলো। ঘুম থেকে উঠে মৃত পাখিটা দেখে ওরা তিনজনই কান্নাকাটি শুরু করে দিল। কী যে বিপদে পড়লাম তা বলে বোঝানো যাবে না। ঠিক হলো দুটো পাখিকে অন্যত্র রেখে আসতে হবে। পাখি দুটো বেশ দুর্বল হয়ে গেছে। ওরাও মরে যেতে পারে। বিন্দিদের সামনে তা হতে দেওয়া যাবে না।

খাঁচার পাখি দুটো নিয়ে আমি চললাম অন্য বাসস্থানের খোঁজে। ওদের বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। কিন্তু উপায় নেই। শিশুদের মনে কষ্ট দেওয়া আর ঠিক হবে না। তিনজনই আমায় প্রশ্ন করল– দাদু, ওদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? উত্তর দিতে পারলাম না, কেননা উত্তর জানা ছিল না।

খাঁচায় পাখি দুটো নিয়ে হাঁটছি। মনটা বিষণ্ন। অনুভব করছি আমার দিকে তাকিয়ে আছে তিন জোড়া জলভরা চোখ। সেই চোখের মায়া বড়ো করুণ।

আবার পড়ি

এই ঝলমলে রোদ যতদিন হাসবে, এই পাখির কলকাকলি, এই গাছের পাতায় হাওয়ার দোলায় ঝিরঝির শব্দ যতদিন আমি শুনব, ভোরের খোলা হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাস নিতে পারব- কী করে আমি জীবনকে ভালোবেসে না থাকতে পারি?

-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিহত হওয়া কিশোরী আনা ফ্রাংক

প্রতিবিম্ব

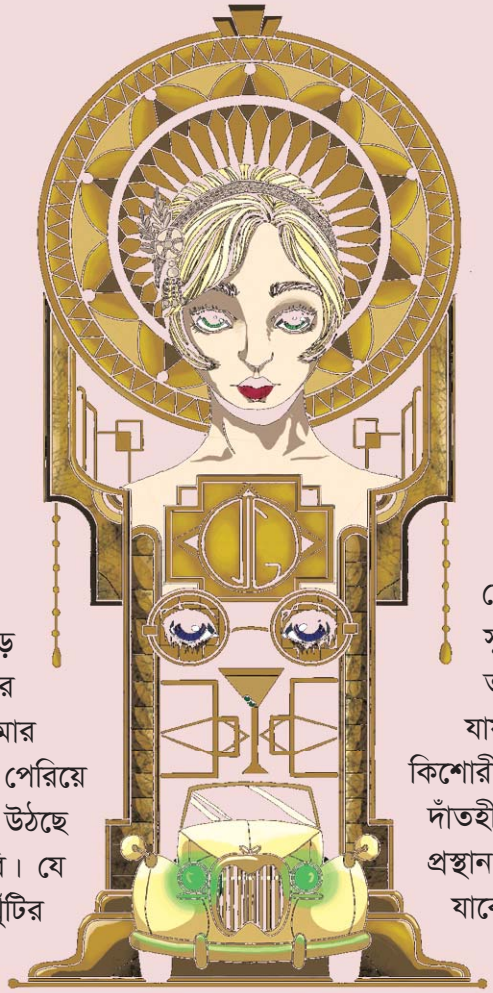

রুকাইয়া রচনা

আজ চিলেকোঠার নড়বড়ে খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে ছানির আলিঙ্গনে আবৃত আমার এ আবছা দৃষ্টিসীমা পেরিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে সে রঙিন দিনগুলোর ছবি। যে দিনগুলোতে এ নড়বড়ে খুঁটির মতোই সামান্য একটি লাঠির ওপর নির্ভরশীল আজকের এ অসাড় পা দুটো মেতে উঠত কত সহস্র দস্যিপনায়! রহিমদের বাড়ির আমবাগান কিংবা পাপ্পুদের তেঁতুলতলা কিছুই রেহাই পেত না আমার এ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে। যে দৃষ্টি আজ লুকিয়ে আছে ছানির পুরু আস্তরণের অন্তরালে। সেদিনের সে বর্ষা মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ কুন্তল আজ ক্রমেই শরত মেঘের শুভ্রতায় প্রাণহীন হয়ে পরেছে। সেদিনের ঘুড়ির পেছনে ওড়ানো এলোমেলো চুলগুলোতে ক্রমেই পাক ধরেছে। যেন এক দুরন্ত পাখি। উড়তে চায় অথচ সে সাধ্য যে আর নেই!

সেদিনের অধরের অন্তরালের সুবিন্যস্ত দাঁতগুলো ক্ষণে ক্ষণে তার অনুপস্থিতি জানান দিয়ে যায়। অনর্গল কথা বলা সে কিশোরীর কথা বলার চেষ্টা মানেই দাঁতহীন মাড়ির ফাঁকে কিছু বাতাসের প্রস্থান আর কিছু দুর্বোধ্য আওয়াজ, যাকে ঠিক ভাষা বলা চলে না! দেহের ইন্দ্রিয়গুলো ক্রমেই আপন স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে পরনির্ভর হয়ে উঠছে। পৃথিবীটা গোল হলেও জীবন তো আর গোল নয়। তাই তো বয়সের ভারে কুঁচকে যাওয়া এ গালের অন্তরালের বালিকা মুখটি আবার ফিরে পাওয়া হবে না। তবু পড়ন্ত বিকেলের আবছা আলোয় আমার এ ঝাপসা দৃষ্টি মিলিয়ে আজ শেষ নিশ্বাস ছাড়তে কোনো কষ্ট নেই। বরং সে দুরন্ত কিশোরীর প্রতিবিম্ব অন্তরে রেখে আমার দাঁতহীন মাড়ির হাসিতে বরণ করে নেব জীবনের অন্তিম লগ্ন।

দশম শ্রেণি, জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ, জয়পুরহাট

ভাল্লাগে না ভাল্লাগে

পাঠক- নাশীদ, প্রপা, আনন্দিতা আর পদ্ম-এর ভাব দেখে কি মনে হচ্ছে, ভাল্লাগে না?

ছবিটি তুলেছেন ফারজানা মীর।

জীবনে ভালো লাগার অনেক কিছু আছে। কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে যা ভালো লাগে না। কোনো কোনো সময় স্কুলে যেতে ভালোই লাগে না। পরে আবার মানুষ হতে হবে ভেবেই স্কুলে দৌড়াই। দুধ, ডিম খেতে পারলেও একটুও ভালো লাগে না কলা খেতে। কলা খেতে বললেই বাবার উপর রাগ হয় খুব। আবার বাবা বুঝিয়ে খাওয়ান। তখন ভালো লাগে। তবে সবচেয়ে খারাপ লাগে কোনো পশু বা পাখির মৃত্যু দেখলে, ভাল্লাগে না যদি দেখি একটি গাছ কোনো কারণে ভেঙে পড়ে আছে আর ভাল্লাগে না মানুষের কষ্ট ! মাঝে মাঝে না বলেই ঘুরতে যেতে ইচ্ছে করে। তবে যাই ভালো না লাগুক, ভালো লাগে লিখতে, ভালো লাগে নবারুণের সাথে থাকতে। নবারুণের সব বন্ধুরা ভালো থাকুক।

নিতু চৌধুরী

৫ম শ্রেণি, চকপাড়া আইডিয়াল পাবলিক স্কুল
চকপাড়া, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর

স্কুল থেকে এসে খেতে বসলাম টিভির সামনে। মা পাশে বসে বলেন, আচ্ছা অভ্র, তোর কী কী ভাল্লাগে না।

হঠাৎ মায়ের মুখে এই কথা শুনে বললাম, এই যে তুমি এখন আমায় এগুলো জিজ্ঞেস করছ, এটাই ভাল্লাগে না। তুমিই তো বলো- খাওয়ার সময় খাওয়া, পড়ার সময় পড়া।

আমার যা যা ভাল্লাগে না, তোমাকে বলছি নবারুণ।

সকাল ৭:৪৫ মিনিটে স্কুল শুরু, তাই ৬:৩০ মিনিটে ঘুম থেকে উঠতে হয়, এটাই প্রথম ভাল্লাগে না। কখনো কখনো দুধ খেতে ইচ্ছে করে না, মা বকা দিয়ে দুধ খাওয়ায়, এটা ভাল্লাগে না। স্কুল টিফিনে মায়ের হাতের বানানো বাহারি খাবার খেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু মায়ের শরীর খারাপ থাকলে দিতে পারে না, দোকান থেকে কিনে খেতে হয়, এটা মোটেই ভাল্লাগে না। এবার আমি জেএসসি পরীক্ষা দিব, প্রতিদিন স্কুল ছুটির পর স্যারদের কাছে পড়তে যেতে ভাল্লাগে না। বেস্ট ফ্রেন্ড অর্পি স্কুলে না এলে আমারও স্কুলে যেতে ভাল্লাগে না। মাঝে মাঝে বাবা-মা কথা কাটাকাটি করে, এটা একদমই ভাল্লাগে না। রৌদ্র আপু অলস টাইপের, বাসায় এলে আমায় দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেয়, আমি কিছু বললে করে দেয় না, এটা মোটেই ভাল্লাগে না। কিছু আত্মীয়স্বজন আছে যাদের সাথে তেমন দেখা হয় না, তাদের সাথে হঠাৎ দেখা হলে ফ্রি ভাবে কথা বলতে পারি না, তাই দেখা হলে ভাল্লাগে না। স্কুলের কিছু মেয়ে আছে দেখলে মনে হয় ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, ওদের সাথে কথা বলতে বা ওদের নিয়ে কথা বলতে ভাল্লাগে না। রোদের মাঝে স্কুলে অ্যাসেম্বলি করতে একেবারেই ভাল্লাগে না। যারা মিথ্যে কথা বলে, যারা অন্যকে কষ্ট দেয় তাদের অসহ্য লাগে, ওদের সাথে মিশতে বা সম্পর্ক রাখতে ভাল্লাগে না। টিভি দেখতে বসলে কোনো কিছু অর্ধেক দেখা হলে মা উঠে যেতে বলে, এটা ভাল্লাগে না। আমার বাসায় ছোটো কোনো ভাইবোন নেই এটা একেবারেই ভাল্লাগে না। ইচ্ছে করলেই ওমেরার (মামাতো বোন) কাছে যেতে পারি না, ওকে আদর করতে পারি না, এসব ভাল্লাগে না। স্কুল সিলেবাসের অনেক কিছুই আমাদের পড়ার প্রয়োজন নেই, তবুও পড়তে হয়, এগুলো ভাল্লাগে না। গান শিখতে চেয়েছি, মা আর্ট একাডেমিতে ভর্তি করেছে, এটা ভাল্লাগে না। ভাল্লাগে না নিয়মকানুন মেনে চলতে, ইচ্ছে করে নিজের মতো ঘুরতে, গল্প করতে, অল্প অল্প পড়তে। স্কুল যাওয়ার সময় অনেক ভারী ব্যাগ নিয়ে যেতে হয় এটাও ভাল্লাগে না। অল্প পড়া অল্প বই অল্প ভারী নিয়েই চলতে ইচ্ছে করে। রবি থেকে বৃহস্পতিবার স্কুল খোলা, লাগাতার যেতে ভাল্লাগে না। একদিন পর পর হলে ভালো হতো। জানি আমাদের কথা কেউ শুনবে না।

অভ্র ফারিহা

৮ম শ্রেণি, বটমলী হোমস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফার্মগেট, ঢাকা

প্রিয় নবারুণ, ভাল্লাগে না ঘুম থেকে ডাকলে, পরীক্ষার পর কী লিখেছি জিজ্ঞেস করলে, পছন্দের পোশাক না কিনে দিলে, দোকানের খাবার খেতে না পারলে, হাতে মোবাইল নেট দেখলেই বাবার খবরদারি, টিভিতে কার্টুন দেখলেই আম্মুর চেঁচামেচি, পিটির ক্লাসে কড়া রোদে স্যারের অত্যাচার, আমার নামের অংশ নিয়ে 'মুন্সী সাহেব' বলে স্যারদের হেয়ালি করে ডাকাডাকি, গোশ্ত না দিয়ে সবজি খাবার চাপাচাপি, বিরক্তিকর অঙ্ক কষা, হঠাৎ করে অ্যাসাইনমেন্ট রচনার হুকুম জারি, কোচিং টিচারদের বাড়াবাড়ি, স্কুল টিফিন নিয়ে কাড়াকাড়ি, আম্মু যেতে দেয় না দাদাবাড়ি, পকেটে না থাকলে টাকাকড়ি, সারাদিন স্কুল বই-এর পড়াপড়ি, মাঝে মাঝেই অসহ্য গরম আর ধুলাবালির ছড়াছড়ি, আসছে জেএসসি পরীক্ষা এখন আমি কী করি ?

মুন্সী তাজীম মাহমুদ

৮ম শ্রেণি, খুলনা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, খুলনা

আমার তো কত কিছুই ভালো লাগে না! কোনো মন্দ কাজই করতে ভালো লাগে না। বন্ধুরা যখন ক্লাসে মারামারি করে বা আমার সাথে ঝগড়া করে, তখন আমার একদম ভালো লাগে না। অনেক বন্ধু পড়া ফাঁকি দিয়ে টিভিতে কার্টুন বা রেসলিং দেখে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যায়- এটা আমার ভালো লাগে না। অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে ভালো লাগে না।

আব্বু-আম্মু যখন বিনা কারণে আমার সম্মুখে ঝগড়া করে, তখন ভালো লাগে না। বাসে উঠলেই ডিজেলের গন্ধে বমি বমি ভাব আসে, তাই বাসে উঠতে পছন্দ করি না। মিষ্টি খেতে বা ঠান্ডা প্রকৃতির খাবার খেতে মজা পাই না- এজন্য মা অবশ্য বকুনি দেয়। আরেকটা কথা, রাজধানীর ট্র্যাফিক জ্যাম মোটেও ভালো লাগে না, একদম অসহ্য!

ফারদিন ছামীম ভুঁইয়া

৭ম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

ভাল্লাগে না'র তালিকা

- মা-বাবা আদর না করলে
- মা বকলে
- বাবা মারলে
- ভাইয়া কথা না শুনলে
- খেলতে না পারলে
- বেশি পড়তে বললে
- ডিসের লাইন চলে গেলে
- কিছু খেতে না পারলে
- কেউ ফাঁকি দিলে বা ঠকালে
- মারপিট করলে
- টিফিন না খেলে
- বিকালে খেলার সময় পড়তে বললে
- বাবা- মা সম্পর্কে কেউ খারাপ কথা বললে
- পুকুরে যেতে না দিলে
- সাইকেল চালাতে না পারলে
- বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম খেলায় হেরে গেলে
- ছুটির দিনে দুইভাই মিলে মারামারি খেলা করতে না পারলে
- ছুটির দিনে ড্রয়িং-এর ক্লাশ করতে
- ঈদের সময় দাদা বাড়ি ও নানা বাড়ি না নিয়ে গেলে

জুনায়েদ তৌহিদ

৪র্থ শ্রেণি, এস এম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।

মাহনুর রৌশন মাহমুদ, দ্বিতীয় শ্রেণি, স্কলাসটিকা স্কুল। বাবা-মাকে জানিয়েছে, ওর কী ভাল্লাগে না।

বাপ্‌স! কত কিছুই না তোমাদের ভাল্লাগে না। বেশ কিছু ভালো না লাগার বিষয় কমন পড়েছে, দেখলাম। কোনো কোনো বিষয় ভালো না লাগাটা ঠিক নয়, যেমন পড়ালেখা করা, সবজি খাওয়া ইত্যাদি। টিভিতে কার্টুন বেশি সময় ধরে দেখতে ভালো লাগলেও সেটা ঠিক নয়। বাবা-মা মাঝে মাঝে বকুনি দিচ্ছেন, সেটা এখন ভাল্লাগছে না। জানো, বড়ো হয়ে গেলে বাবা-মাকে গিয়ে বলতে হবে, প্লিজ একটু বকো। ছোটোবেলায় বাবা-মায়ের বকুনি না খেলে ছোটোবেলার আনন্দ পূর্ণ হয় না, সেটা তুমি বড়ো হয়ে গেলেই টের পাবে।

যা-ই হোক, তোমার যে ভাল্লাগে না, এটাও তো সত্যি। কেন তোমার ভাল্লাগে না? জানতে হবে। জানতে হবে।

তোমার সম্বন্ধে অজানা ১০ তথ্য

১. তুমি এখন এই লেখাটি পড়ছ
২. তুমি বুঝে যাবে, এই সত্যগুলো যা এবং তা!!
৪. তুমি খেয়াল করোনি, আমি ৩ নম্বর তথ্য হাওয়া করে দিয়েছি
৫. এখন তুমি গুনছ, আর কোনো নম্বর বাদ গেল
৬. তুমি হাসছ
৭. এরপরও পড়ছ, যদিও সত্যগুলো যা এবং তা!
৯. আবারো কোনো নম্বর বাদ গেল কি না, গুণে দেখছ
১০. তুমি হাসছ। তোমার ভালো লেগেছে নিজের সম্বন্ধে জেনে, তাই না?

বন্ধু নাজিবা সায়েম পাখির মতো ডানা মেলে দিয়েছে আকাশে। কেননা, ওর ভাল্লাগে, খু-উ-ব ভাল্লাগে। দারুণ এই ছবিটি তুলেছেন বি.এম. তাহম্মুল কবীর

‘ভাল্লাগে না’ কেন ?

সাঈদ চৌধুরী

সবার জীবনেই এই মজার সময় আসে। এই সময়টি হলো শিশু থেকে একটু বড়ো হয়ে ওঠার সময়। শিশু বলতে এখনো আমরা কিন্তু আঠারো বছর পর্যন্তই বুঝি। কিন্তু শিশুরা এই আঠারো বছরের মধ্যে কয়েকটি ধাপ পার করে। এই ধাপগুলো পার করার মধ্যেই কিছু সময় থাকে যা জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়। যদি বারো বছরের একজন শিশুর মন বুঝতে চায় কেউ তবে তাকে বারো বছরেই আবার ফিরতে হবে।

এই শিশুগুলো যেমনি থাকে পরিবারকেন্দ্রিক তেমনি তাদের মধ্যে বেড়ে ওঠে বাইরে যাওয়ার ও নিজেকে নিজের উপর ভর করে চলার প্রবণতা। খুব স্বাভাবিকভাবেই পরিবার কেন্দ্রিকতাকে সে ভাবতে শুরু করে আমাকে বুঝি বাবা-মা আটকে রাখতে চায় এরকমটা। তখন তার মধ্যে বিচরণ করতে শুরু করে সামান্য বিচ্যুতি আর হতাশার কিছু ছাপ। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেও এমন একটি ভাব করে যা দেখে মনে হয় শিশুটি বোধহয় খুব রাগী অথবা কারো কথা শোনে না।

কৈশোর নামে যে সময়টিকে আমরা মনে করি আসলে এ সময়টিই জীবনের উল্লেখযোগ্য সময়। এ সময়টির উপরই নির্ভর করে সারাজীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে জয় করার সক্ষমতা অর্জন। আমার বাবার কৈশোর জীবন ছিল খুব সংগ্রামের। তার অনেক কিছু না ভালো লাগার কাজের মধ্যে ছিল অন্যেরা তাকে শুধু আদেশ করবে সেটা মেনে নেওয়া। তার ছিল খুব সংগ্রামী জীবন। তিনি অন্যের বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করতেন। অষ্টম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায়ই তাকে পড়াতে হতো ঐ বাড়ির শিশুদেরকে !

হয়ত তিনি পড়তে বসেছেন তখনই বাড়ির কর্তা ডেকে বসলেন এবং বললেন আমার বাচ্চাদেরকে পড়িয়ে তারপর পড়তে বসো। আমার বাবার এই বিষয়টা ভালো লাগত না। সে এই না ভালো লাগার কারণ আমার দাদাকে জানায়। দাদা বুঝতে পারেন ছেলে মন খারাপ করছে। এতে সে পড়াশোনা বাদ দিতে পারে আর তাতে পড়াশোনায় খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। তাই আর দেরি না করে বাবার পাশে দাঁড়ান আমার দাদা এবং চলে আসতে বলেন বাড়িতে। বাবা চলেও আসে ঐ বাড়ি থেকে। তারপর শুরু হয় বাড়ি থেকে প্রায় ছয় মাইলের পথ হেঁটে গিয়ে স্কুলে পড়া। এত কষ্ট করে পড়ে পাস করেন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক তারপর গ্রাজুয়েশান। সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে যান একদিন।

কিছুদিন আগের ঘটনা। একটি বাচ্চাকে প্রায়ই দেখি সে খুব সাইকেল চালাতে চায়। সাইকেল চালাতে না পারলে অথবা একটু চালিয়ে গিয়ে পড়ে গেলেই মন খারাপ করে বসে থাকে। মন খারাপ করে বসে থাকে বলে তার মাও তার সাথে খুব রাগারাগি করে। বাচ্চাটির আরো মন খারাপ হয়। সে গিয়ে শুয়ে থাকে অন্য ঘরে। শিশুটির মন ভালো করার কোনো ব্যবস্থাই নেন না বাবা অথবা মা। শিশুটি এক সময় নিজেই আবার উঠে এসে তার কাজগুলো শুরু করে এবং এভাবেই এক সময় বাবা মায়ের সাথে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এক সময় শিশুটিকে দেখতাম পড়াশোনা প্রায় বাদই দিয়েছে!

যে কথা থেকে দুটো গল্প বললাম সেটা হলো শিশু থেকে একটু বড়ো হওয়া এই কৈশোর জীবনটাই খুব বেশি বৈচিত্র্যময়। ‘ভাল্লাগে না’ যে সময়টার প্রধানতম একটি শব্দ বলা যেতে পারে। খাবার খাওয়া থেকে শুরু করে পছন্দের অনেক উপকরণই এ বয়সে খুব বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে দৈহিক পরিবর্তন অন্যদিকে মানসিকভাবে নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপনের চাপ দুইয়ে মিলে শিশুদের মাঝে কৈশোর বয়সটি যেন

একটি উল্লেখযোগ্য সময়। তবে এ সময়টি যেমন মানুষকে তার শ্রেষ্ঠত্বের জায়গায় নিয়ে যেতে পারে তেমনি এ সময়ের কারণে পিছিয়ে পড়ে অন্য কিছুতে আসক্ত হয়ে পড়তে পারে সন্তানেরা।

খুব স্বাভাবিক করে আমি আমার সন্তানকে যেটা বলি সেটা হলো 'যে কাজটি তোমার ভালো লাগে না সে কাজটিকে নিয়ে তুমি যুক্তির জায়গায় দাঁড়াও। তারপর ভাবো এবং সিদ্ধান্ত নাও'।

প্রায়ই দেখতাম আমার সন্তান ছবি আঁকতে গিয়ে এক লাইন এঁকে তারপর আর আঁকতে পারছে না এবং কাগজ নষ্ট করছে আর রাগ করে বলছে হচ্ছে না কেন!

একদিন বললাম 'শোনো একটি কাগজ তৈরি করতে তিন লিটার পানির প্রয়োজন হয়, বাঁশ প্রয়োজন হয়, লাগে গাছের কিছু অংশ। তারমানে কাগজ নষ্ট করে ফেললে তুমি কতগুলো জিনিস নষ্ট করছ বুঝতে পারো'।

সে চুপ করে শুনেছিল সেদিন। তারপর কাগজের অপব্যয় নিয়ে নিজেই একটা লিখা লিখল এবং তা ভিডিও করে সবাইকে জানালো। আমি কিন্তু তাকে বুঝিয়ে তার 'ভাল্লাগে নার' জায়গা থেকে সরিয়ে এনেছি। এখন সে কাগজের অপচয় করে না।

তোমাদেরকেও বলি, তোমাদের কৈশর জীবনে যেটা তোমার ভালো লাগে না সেখানেই তুমি যুক্তি নিয়ে এসে দাঁড় করাও। মনে রাখবে এমন কিছু ভালো লাগা উচিত নয় যেটা অন্যের ক্ষতির কারণ, নিজের শরীরের ক্ষতির কারণ এবং যা করলে অন্যজনে ভাবে এটা খারাপ।

ধরো তোমার পড়তে ভালো লাগে না। তুমি বিবেচনায় নাও তুমি কেন পড়ছ। তারপর যদি তুমি দেখো পড়াশোনাতেই তুমি যে স্বপ্ন দেখতে চাও সেটা তোমার কাছে আসছে, তোমার মা- বাবার এবং দেশের উপকারে আসছে তাহলে পড়াশোনাই করো মন দিয়ে।

মনে রাখবে 'ভাল্লাগে না' শব্দটির ঠিক পেছনে যে ভালো লাগাটা আছে তার স্বাদটুকু পেতে হলে তোমাকে অবশ্যই 'ভাল্লাগে নাকে' জয় করেই সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তোমাকে চিন্তা করতে হবে তুমি যা পেতে চাও তাতে তোমার আনন্দের সবটুকু উপাদান তোমাকেই যোগ করে নিতে হবে।

ভাল্লাগে না

সুমাইয়া আক্তার

ভাল্লাগে না বাসার খাওয়া
লাগে ফাস্টফুড খেতে
খেয়ে ফুচকা-চটপটি
থাকি বন্ধুদের সাথে মেতে।

বাবার শাসন মায়ের বকা
না লাগলেও খাই
এত্ত এত্ত বকা খেয়ে
আবার ভুলে যাই।

সপ্তম শ্রেণি, যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

ছুঃ মন্তর ছুঃ

ভাল্লাগানোর ৫টি উপায়

১. বিশ্বাস রাখো
২. চেষ্টা চালিয়ে যাও, হাল ছেড়ো না
৩. সবকিছু সহজভাবে ভাবো, সহজ উপায়ে করো
৪. সমস্যায় পড়লে হেসে নাও একটু, সমাধানের সময়ও হাসিখুশি থাকবে
৫. সবসময় শিশু থেকো। শিশুদের মতো উৎসাহী আর কৌতূহলী থেকো। খবরদার বড়ো হবে না। তাহলেই কিন্তু আর কাজ করবে না এই উপায়গুলো।

বড়ো হওয়ার স্বাস্থ্য-সত্য

ডা. নুরুল হক

পরিবারের মধ্যে একটি শিশুর আগমন সবার মাঝে আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। পরিবারের সকলের আদর-স্নেহে ও মায়ের যত্নে শিশুটি ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে। শিশুটি বড়ো হওয়ার ৫ বছর বয়স পর্যন্ত বলা হয় শিশুর শৈশবকাল। শৈশবকালে ছেলে-মেয়েদের শিশু বলা হয়।

এরপর ৬ থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত বলা হয় বাল্যকাল। এগারো থেকে আঠারো বা উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েকে কিশোর বা কিশোরী বলা হয়ে থাকে। আর কিশোর-কিশোরীদের এই সময়কে বলা হয় বয়ঃসন্ধিকাল।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর ও কিশোরীরা দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে। শরীর এবং শরীরবৃত্ত সংক্রান্ত পরিবর্তনের ফলে এ সময়ে কিশোর ও কিশোরীরা নতুন জগতে প্রবেশ করে। এই বয়ঃসন্ধিকাল হলো একাধারে দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক এক অভিজ্ঞতা। দেহ তৈরি এবং শরীর কখন কীভাবে বাড়বে তা নিয়ন্ত্রণ করে হরমোন। হরমোন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। ছেলেদের যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে তা টেস্টোস্টেরন নামক হরমোনের কারণে হয়। আর ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন নামে দুটি হরমোন মেয়েদের শরীর ও মনের বিভিন্ন পরিবর্তনে কাজ করে।

একটি ছেলে বা মেয়ে যখন শৈশব পেরিয়ে বয়ঃসন্ধিকালে প্রবেশ করে তখন তার টেস্টোস্টেরন বা ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোন তৈরি হতে থাকে। সাধারণভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে ৯-১৫ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১২-১৫ বছর বয়সে এই পরিবর্তন এসে থাকে। এখানে উল্লেখ্য, আমাদের দেশে সত্তর-আশির দশকে একটি ছেলে ১৪-১৫ বছর এবং একটি মেয়ে ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সের আগে শরীরে হরমোনজনিত কোনো লক্ষণ দেখতে পেত না। কিন্তু ইদানীং একটি ছেলে ১৪ বছর এবং একটি মেয়ে ১১ বছর বয়সের আগেই সাবালকত্ব অর্জন করে। এর পেছনে দায়ী আধুনিক প্রযুক্তির আগ্রাসন। ফলে অসময়ে এবং দ্রুত বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হচ্ছে আমাদের সন্তানেরা।

এর পেছনে আরো একটি কারণকে দায়ী করা হয়। সেটি হলো ফার্মে উৎপাদিত আমিষ এবং কৃত্রিম উপায়ে ও প্রিজারভেটিভ দেওয়া খাবার অতিরিক্ত গ্রহণ। এতে শারীরিক বৃদ্ধিও ঘটছে অতি দ্রুত।

উল্লিখিত নানাবিধ কারণে পরিণত সময়ের পূর্বেই তারা মানসিক পরিপক্কতা অর্জন করছে– যা তাদের দৈহিক পরিবর্তনের সূচনা করছে।

আমাদের দেশে সচরাচর ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সের একটি ছেলের এবং ৯ থেকে ১১ বছর বয়সের এক মেয়ের মধ্যে উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে কণ্ঠস্বর ভারি হয় এবং শারীরিক গঠনের বিভিন্ন পরিবর্তন শুরু হয়।

বয়ঃসন্ধিকাল প্রতিটি কিশোর ও কিশোরীদের জীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে কিশোর ও কিশোরী শারীরিকভাবে একজন পরিপূর্ণ পুরুষ ও নারীতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময় কিশোর ও কিশোরীরা দ্রুত বেড়ে উঠার সাথে শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনগুলো অনেকটা হঠাৎ শুরু হয় এবং এই পরিবর্তন তাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। স্বাভাবিক কারণেই এ সময় তারা মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়ে থাকে। এগুলোর সাথে পরিচিত না থাকায় তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। বিশেষ করে হরমোনজনিত কারণে বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীদের যে পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে একটি ঋতুস্রাব। এটি কিশোরীদের জন্য একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া। এ সময়টা তাদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ছাড়াও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা আবশ্যক। যথেষ্ট পরিমাণ পানি ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, ঠিকমতো ঘুমানো ও বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।

ঋতুস্রাবজনিত কারণে তাদের শরীরে নানারকম লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন- শরীরে দুর্বল বোধ করা, মাথা ঘুরানো, তলপেটে ব্যথা, খাবারে অরুচি, পায়ে ব্যথা অনুভব ও হাঁটাচলায় অনীহা ইত্যাদি। এই পরিবর্তনের ফলে তারা অনেক সময় আতঙ্কিত হয়। অনেকের মধ্যে বিষণ্নতা দেখা দেয়। এরকম কিছু হলে মা বা বড়ো বোন বা পরিবারের নির্ভরযোগ্য কারোর সাথে আলাপ করে জেনে নিতে পারো। এতে জীবনে প্রথম এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেও স্বাভাবিকভাবেই সবকিছুকে গ্রহণ করতে পারবে।

ঋতুস্রাব নিয়মিত না হলে কিংবা ঋতুস্রাবকালীন সমস্যাগুলো দীর্ঘায়িত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। তবে মনে রাখতে হবে, সামান্য অনিয়মে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ নতুন একটি জৈবিক চক্রকে শরীরের আত্মস্থ করতে একটু সময় লাগবে বৈকি।

একইভাবে কিশোরদের হরমোনজনিত পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক শারীরিক ঘটনা। ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত বা স্বপ্নবাস ছেলেদের জন্য একটি নিয়মিত বিষয়। সপ্তাহে, মাসে কিংবা কিছুদিন পর পর এরকমটা হওয়া খারাপ কিছু নয়।

হরমোনজনিত পরিবর্তনে কিশোর ও কিশোরীরা নানা অজানা বিষয়ের মুখোমুখি হয়। অনেক সময় কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তারা নতুন অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করে। এর পরিণতি বেশিরভাগই খারাপ হতে পারে। সঠিক জ্ঞানের অভাবে তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তারা লজ্জা, ভয় ও সংকোচের কারণে কাউকে কিছু বলতে পারে না। এমনকি মা-বাবাকেও না। এ ব্যাপারে তারা বন্ধুবান্ধবদের সাথে আলোচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এর ফলে তারা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল ধারণা লাভ করে থাকে। বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে বা তাদের পরামর্শে ধূমপান, মাদক, অবৈধ ও নীতি বিবর্জিত নানা ধরনের কাজের সাথে জড়িয়ে যেতে পারে। কাজেই, সাবধান থেকো। বন্ধু চিনতে ভুল করো না। মনে রেখো, যে বন্ধু খারাপ কাজে উৎসাহ দেয়, সে কখনোই বন্ধু নয়। সবচেয়ে বড়ো বন্ধু বাবা-মা এবং ভাইবোনেরা। তাই, কিশোর বয়সীদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। নজর রাখতে হবে ওর বন্ধুদের প্রতি।

কৈশোর বয়সে একজন ছেলে বা মেয়ে অনেক আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। তারা এসময় কৌতূহলবশত বা নতুন ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কোনো কিছুর সাথে জড়িয়ে যেতে পারে। এজন্য বিশেষ করে বাবা-মা এবং বড়ো ভাইবোনদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। মনের ভেতর কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কোনো সমস্যার কথা আলোচনা করে তাদের সহযোগিতা নিতে পারো।

বর্তমানে মোবাইল ফোন ও ইন্টানেটের মাধ্যমে ইউটিউব ও গুগলের ভালো দিকগুলো বাদ দিয়ে কোনো কোনো কিশোর-কিশোরী খারাপ দিকগুলোর দিকে ধাবিত হচ্ছে। রাতের ঘুম বাদ দিয়ে চ্যাটিং আর ফেসবুকে ডুবে থাকে। অনেক দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা তাদের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

আজকের কিশোর-কিশোরীরা জানে না– রাতের ঘুম শরীরের জন্য কতটা উপকারী। রাতের ৮ ঘণ্টা ঘুম, দিনের ৮ ঘণ্টা ঘুমের সমান কখনোই হবে না। ক্রমাগত রাত জাগা মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র, লিভার ও কিডনির ক্ষতি করে। পাশাপাশি বদহজম, খাবারে অরুচি, মেজাজ খিটমিটে হয়ে যায়। মোবাইল ফোন ও ফেসবুক আসক্তিকে ডিজিটাল কোকেন বললেও হয়ত ভুল হবে না। বিষয়গুলো পরিবারের মা-বাবা, ভাইবোন ও আত্মীয়স্বজন সকলের নজর রাখা দরকার। কিশোর বয়সী সন্তানটি রাতে পড়ার টেবিলে বই খাতার উপর মোবাইল রেখে পড়ছে না ফেসবুকে স্ট্যাটাস লিখছে নাকি পর্ণোছবি দেখছে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। রুমের দরজা বন্ধ অবস্থায় সন্তানকে দীর্ঘসময় একাকী থাকতে দেখলে খোঁজ নেওয়া উচিত– সে আসলে কী করছে?

কিশোর-কিশোরীদেরও বুঝতে হবে, তাদের ইচ্ছা বা মতামতের মূল্য যদি কেউ না দেয় অথবা ভুল বুঝে, তাহলে কি তারা নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই করবে? কখনই না, মনে রাখতে হবে জীবনটা তোমার আর একে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তোমারই।

তবে কিশোর বয়সিদের মধ্যে অস্বাভাবিক বা খারাপ কিছু দেখলে তাদের অপমান করা, তীব্রভাবে গালমন্দ করা বা শারীরিক ও মানসিকভাবে আঘাত করা উচিত নয়। এতে তাদের কর্মদক্ষতা হ্রাস পায় এবং চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা কমে যায়। তাই বলে কি তাদের শাসন করা যাবে না? অবশ্যই যাবে। তবে প্রথমে তাদের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে পরিবারের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা করা দরকার।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন অঙ্গে নানা ধরনের রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। এ বিষয়ে সচেতন থেকো।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর ও কিশোরীদের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্যের পাশাপাশি প্রয়োজন নিরাপদ পরিবেশ। এ বয়সে তারা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদি শারীরিক কসরতের কিছু না কিছু কাজ করে থাকে। এ কারণে তাদের বেশি ক্যালোরি বা খাদ্যশক্তি প্রয়োজন হয়। দেহের গঠন ও বৃদ্ধিসাধন, ক্ষয়পূরণ, তাপ ও কর্মশক্তি জোগান, দেহের রোগ প্রতিরোধ, বিভিন্ন অঙ্গ সবল রাখতে এবং খাদ্যদ্রব্য হজম, রক্ত চলাচল, দেহ কোষের পুষ্টি জোগানে আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ ও পানির প্রয়োজন।

বয়ঃসন্ধিকালে সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও শারীরিক পরিশ্রমের অভ্যাস যেমন গড়ে তোলা উচিত, তেমনি সঠিক পরিমাণ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাবার গ্রহণ করার অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। পাশাপাশি নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য মা-বাবাসহ পরিবারের সকল সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা দরকার। শিশুরা পরিবার থেকে, পরিবারের বড়োদের ও স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখার কৌশল জেনে নিতে পারে। পরিবার থেকে এমন কোনো আচরণ করা ঠিক নয় যা শিশুর মেধা বিকাশ বাধাগ্রস্ত করবে।

কিশোর-কিশোরীরা কখনো কখনো আবেগের বশীভূত হয়ে অপরাধমূলক গুরুতর কাজ করতে দ্বিধা করে না। এক্ষেত্রে একজন বাবা ছেলের সাথে এবং একজন মা মেয়ের সাথে বন্ধুর মতো তার চাহিদা ও ইচ্ছার ভালো-মন্দ দিকগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে পারেন। রাগ নয়, তাদেরকে স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে বুঝাতে হবে। তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শেখাতে হবে- যাতে তারা খারাপ পথে ধাবিত না হয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে কঠোর না হয়ে অভিভাবক, শিক্ষক সবাইকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

একই সাথে কিশোর-কিশোরীদেরও বুঝতে হবে, তাদের ইচ্ছা বা মতামতের মূল্য যদি কেউ না দেয় অথবা ভুল বুঝে, তাহলে কী তারা নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই করবে? কখনোই না, মনে রাখতে হবে জীবনটা তোমার আর একে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তোমারই।

ইন্টারনেটে থাকি নিরাপদ

মেজবাউল হক

দিন দিন বাড়ছে ইন্টারনেটের ব্যবহার। পাশাপাশি বাড়ছে ইন্টারনেটের নিরাপত্তা ঝুঁকিও। হ্যাকারদের অব্যাহত আক্রমণে কেবল ব্যক্তি নয়, বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলোও শিকার হচ্ছে সাইবার আক্রমণের। পাশাপাশি নানা ধরনের ভাইরাস, ম্যালওয়্যার, স্পাইওয়্যারসহ অন্যান্য ক্ষতিকর মাধ্যম দিয়েও প্রতিনিয়ত ঝামেলার মুখোমুখি হতে পারো যে কেউ। তবে সতকর্তা গ্রহণ করতে পারলে এসব ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। এসো জেনে নেই অনলাইনে নিরাপদ থাকার কিছু টিপস –

- নিজের ব্যক্তিগত ই-মেইল ঠিকানাটি সবাইকে দেবে না। কেবল বন্ধু এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গেই ই-মেইল ঠিকানাটি শেয়ার করবে। যত্রতত্র ই-মেইল ঠিকানা শেয়ার করলে প্রচুর পরিমাণে স্প্যাম মেইলে ভরে যাবে তোমার ই-মেইল।
- অনলাইনে অপরিচিতদের থেকে দূরে থাকতে হবে। অনলাইনে বিভিন্ন সাইট থেকে বিভিন্ন আকর্ষণীয় অফারে ভরে যেতে পারে তোমার ই-মেইলের ইনবক্স অথবা ব্লগের দেয়াল। ফেসবুকেও অপরিচিত অনেকের কাছ থেকেই আসতে পারে বন্ধুত্বের অনুরোধ। এসব অফারে বা অনুরোধে সাড়া দিতে থাকতে হবে সাবধান। কারণ এসবে লুকিয়ে রয়েছে কোনো না কোনো হ্যাকার। ফেসবুকে বন্ধুত্বের অনুরোধে সাড়া দিতে খেয়াল রাখতে হবে বিশ্বস্ততা ও যথাযথ পরিচিতির বিষয়টিও।
- পাসওয়ার্ড নিয়ে থাকবে বাড়তি সতর্কতা। নিজের পাসওয়ার্ডটি কারো সঙ্গেই শেয়ার করবে না। এমনকি নিজের ব্রাউজারেও পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ না করাই শ্রেয়। পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখার জন্য ভালো এবং বিশ্বস্ত পাসওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট টুলস ব্যবহার করা নিরাপদ। আর শেয়ার করার বিষয়টি একেবারেই ভুলে যেতে হবে।
- ই-কমার্সের এই যুগে এসে অনলাইনে কেনাকাটা একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার। আর এই সুযোগে ক্রেডিট কার্ড বা সংশ্লিষ্ট তথ্য চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বিশ্বস্ত সাইট ছাড়া আর্থিক লেনদেনের কোনো তথ্য না দেওয়াই উত্তম।
- এছাড়াও সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোডে সাবধানতা অবলম্বন করবে। এজন্য যে-কোনো সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে অথেনটিক সোর্স যাচাই-বাছাই করে।
- আজকাল ফ্রি খাবারের চেয়ে ফ্রি ওয়াইফাইয়-এর চাহিদা সবচেয়ে বেশি। তাই তো শপিং মল, গাড়ি, রেস্টুরেন্টসহ বিভিন্ন পাবলিক ওয়াইফাই এর প্রতি সবার আকর্ষণ প্রবল। কিন্তু এসব ওয়াইফাই-এর নেটওয়ার্ক খুবই দুর্বল। হ্যাকাররা এ ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে তথ্য চুরি করার জন্য ওত পেতে থাকে। তাই এ ধরনের ওয়াইফাই ব্যবহার না করা উত্তম। প্রয়োজনে VPN ব্যবহার করবে। VPN তোমার ও হ্যাকারের মধ্যে দেয়াল তৈরি করবে।
- বানান ও গ্রামার ভুল আছে, এমন পোস্টের লিংকে ক্লিক করা থেকে নিজেদের বিরত রাখবে।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ব্যক্তিগত তথ্য যেমন- নিজের ছবি, কোনো আইডি কার্ড, ফোন নম্বর ও বাসার ঠিকানা না দেওয়া উত্তম।
- অনলাইনে পরিচিত হওয়া কারো সাথে একা দেখা করা একদম নিরাপদ নয়। দরকার হলে কাউকে সাথে নিয়ে যাবে। যদি কাউকে নিয়ে যেতে না পারো তাহলে অন্তত কাউকে জানিয়ে রেখো যে তুমি কার সাথে কোথায় দেখা করতে যাচ্ছ।

বই আলোচনা

তোমাদের জন্য জরুরি বই

আহমেদ কাওসার

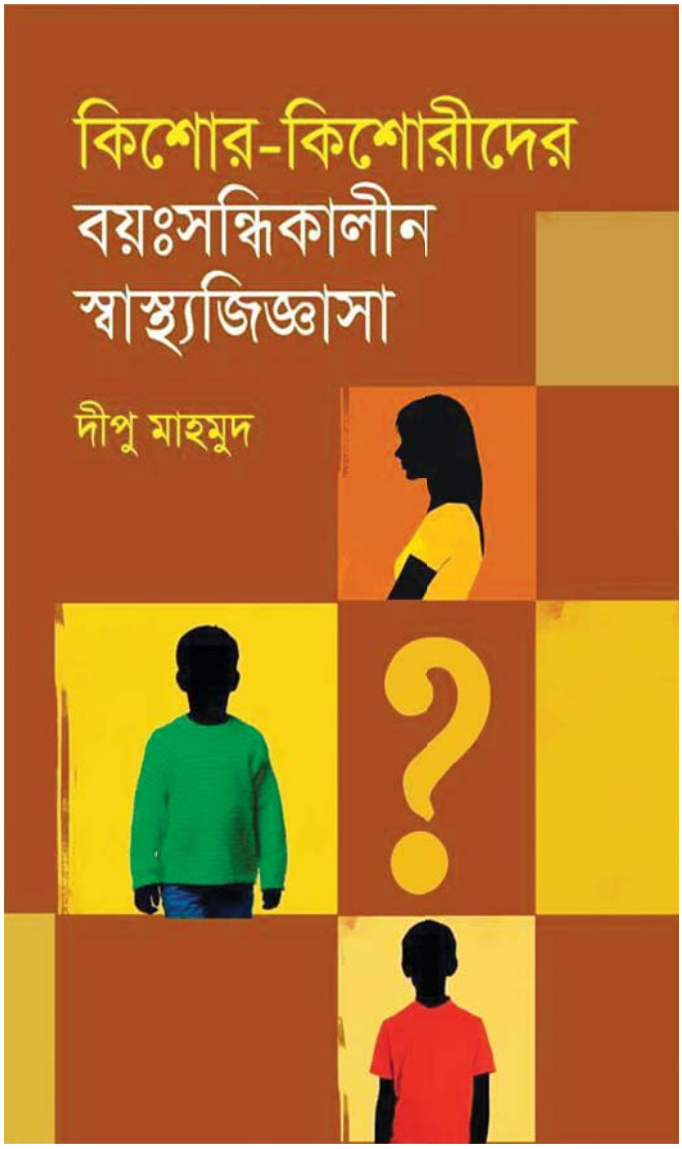

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছোটোগল্প 'ছুটি'-র প্রধান চরিত্র ফটিকের কিশোর বয়সটাকে নিয়ে লিখেছেন, 'তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে , পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্ম বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না; কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে।'

একদম ঠিক কথা। মানবজীবনের এই বয়সটায় কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মনোজগতে যে বড়ো রকম পরিবর্তন ঘটে, তার খোঁজখবর কজন রাখি আমরা? আমাদের আত্মসচেতনতা বাড়াতেই এই বই- কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যজিজ্ঞাসা।

কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যজিজ্ঞাসা লেখকের অনেক দিনের কাজের ফসল। কিশোর-কিশোরীদের কাছ থেকে তিনি তাদের জিজ্ঞাসাগুলো জেনেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইয়ে তার উত্তর খুঁজেছেন, যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। চিকিৎসকদের সাথে আলোচনা করেছেন, পরামর্শ নিয়েছেন। তারপর যুক্তি দিয়ে কিশোর-কিশোরীদের জিজ্ঞাসার উত্তর তৈরি করেছেন লেখক দীপু মাহমুদ। এসব নিয়েই 'কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যজিজ্ঞাসা' বই।

বইটি প্রকাশ করেছে সূচীপত্র। প্রচ্ছদ: নিয়াজ চৌধুরী তুলি। মূল্য : ৪০০/- টাকা। নিঃসন্দেহে তোমাদের সংগ্রহে রাখার মতো বই এটি।

সাফওয়ান রেজা অদ্রি মনে হয় শিখাকে-ই এঁকেছে। অদ্রি পড়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ধানমন্ডি শাখা, ঢাকা

বর্ণালী চৌধুরী'র গল্প

আকাশে মেঘের আনাগোনা

বারান্দার ছোট্ট খাঁটে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে শিখা। জানালা দিয়ে আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখছে। ছোটো-বড়ো মেঘের টুকরোগুলো যেন দৌড়ের পাল্লা দিচ্ছে। কে কার আগে যাবে সেই প্রতিযোগিতা ওদের। ওর মনেও এমনি অজানা ভয়েরা ছুটোছুটি করছে। দুদিন হলো ভয়টা ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। মাথার ভেতর দড়িলাফের এক, দুই, তিন গোনার শব্দগুলো কেমন যেন বেসুরো বাজছে। এক্কা দোক্কা খেলার মাটির চাঁড়াটা যেন কোর্টের বাইরে দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অ-নে-ক দূরে চলে যাচ্ছে।

এক ঝট্‌কায় বিছানায় উঠে বসে শিখা। বুকের মধ্যে শুধু ভয়ের অনুভূতি। তাহলে কি আর কোনো দিন দড়িলাফ, এক্কাদোক্কা, দাঁড়িয়াবাধা, বউচি খেলা হবে না? এসব খেলা যে ওর ভীষণ পছন্দের। কিছুক্ষণ পরে পরে শিখা বাথরুমে যায়। আর তখনই ওর মনের ভেতর ভয়টা আরো বেড়ে যায়। বুক ফেটে কান্না আসে।

হঠাৎ মনে পড়ে রিবিকার কথা। ওর চেয়ে একটু বড়ো হলেও রিবিকা ওর ভালো বন্ধু। শিখা চুপিচুপি রিবিকাদের বাড়ি যায়।

রিবিকা ওকে দেখে এগিয়ে আসে। কেমন আছিস

শিখা? তোর চেহারা এমন লাগছে কেন? কী হয়েছে তোর?

শিখা একসাথে এত প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। রিবিকার হাত ধরে উঠানের একপাশে নিয়ে যায়। বলে, আমি ভালো নেই রিবিকা। আমার মনে হয় বড়ো কোনো অসুখ হয়েছে? আর মনে হয় বাঁচব না।

রিবিকার চোখ ছানাবড়া, বলিস কী? কী হয়েছে তোর?

শিখা ফিসফিস করে বলে, আজ দুদিন ধরে বাথরুম করতে গিয়ে দেখি আমার পায়জামায় তাজা রক্ত লেগে থাকে। আমি খুব ভয়ে আছি। কাউকে কিছু বলিনি।

ও এই কথা- রিবিকা হাসে। এত ভয় করিস না, ঠিক হয়ে যাবে। তোর মাকে বলেছিস?

শিখা বলে, মাকে বলিনি। খুব ভয় করছে। আর লজ্জাও লাগছে।

রিবিকা বলে, আমার সাথে তোদের বাসায় চল, আমি খালাম্মাকে তোর হয়ে সব বলে দিচ্ছি।

রিবিকা শিখার হাত ধরে ওদের বাড়ির দিকে যায়। শিখা অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বাড়িতে ঢোকে।

রিবিকা শিখাকে উঠানে দাঁড়াতে বলে। ও ভেতরে গিয়ে শিখার মায়ের সাথে কথা বলে। সব শুনে শিখার মা দৌড়ে উঠানে এসে শিখাকে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, আমার লক্ষ্মী সোনা মেয়েটা সত্যি সত্যি দেখি বড়ো হয়ে যাচ্ছে!! আমাকে এত বড়ো একটা খবর লুকিয়ে রেখেছে।

মা ওদের দুজনকে ঘরে বসিয়ে কিছু একটা আনতে ঘরের বাইরে যান। খুব দ্রুতই তিনি একটা প্যাকেট নিয়ে ঘরে ঢোকেন। শিখার মনে পড়ে এমন প্যাকেট সে কোথায় যেন দেখেছে। এবার মনে পড়ে টিভিতে বিজ্ঞাপনে দেখেছে, ওষুধের ফার্মেসিতে দেখেছে।

মা হাসি হাসি মুখে শিখাকে বলেন, ভয় নেই মা, তোমার কোনো অসুখ হয়নি। মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের বেশ কিছু পরিবর্তন আসে। ঋতুস্রাব তার মধ্যে অন্যতম। তোমার যা হয়েছে তাকে ঋতুস্রাব বলে। প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ে তিন থেকে পাঁচদিন অথবা কারো কারো সাতদিন এমন ঋতুস্রাব হয়। এটা শরীরের স্বাভাবিক একটা রুটিন ওয়ার্ক।

মা আরো বলেন, এই কদিন একটু বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হয়। আর তা হলো সেনিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করতে হয়। পাশাপাশি ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করতে হবে, গোসল করতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে সেসবও বলেন। এরপর তিনি সেটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখাকে বুঝিয়ে দেন।

মা বলেন, তুমি সব কাজ যেমন পড়াশোনা, খেলাধুলা, গান শেখা সব কিছু স্বাভাবিকভাবেই করতে পারবে। সব শুনে শিখার মুখে হাসি ফোটে। সে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচে। রিবিকা শিখাকে বলে, তুই আচ্ছা বোকা তো! ঘরে মা কে না বলে নিজে নিজে ভয়ে মরে যাচ্ছিস! আমি তো আগেই মা আর বড়ো আপুকে বলেছি। ওরা আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছিল।

এবার শিখা রিবিকাকে জড়িয়ে ধরে আর বলে, তুই আমার অনেক ভালো বন্ধু। রিবিকা বলে, এবার আমাকে ছাড় আর খালাম্মা যেভাবে বলেছে সেভাবে তৈরি হয়ে নে।

শিখা গোসল সেরে উঠানে এসে দাঁড়ায়। তাকিয়ে দেখে, আকাশে সেই ছোটো-বড়ো মেঘের টুকরোগুলো আর নেই। গাঢ় নীল আকাশটা সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। মায়ের কথায় ওর মনের আকাশে ভয়ের মেঘগুলোও বুঝি এমনি করে হারিয়ে গেছে। নিজেকে ওর বড্ড ভারমুক্ত আর অন্যরকম লাগে আজ।

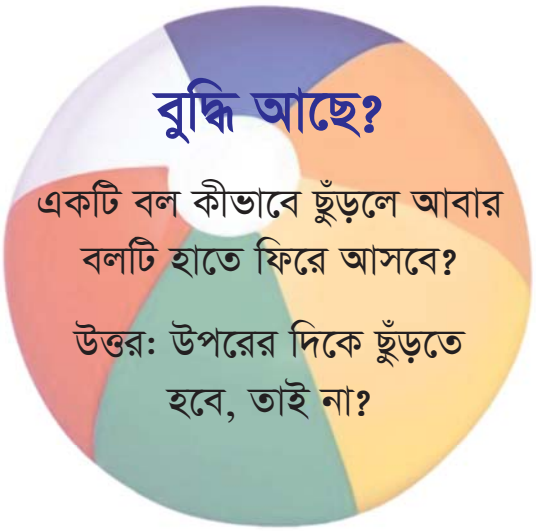

এই দেশ

রাকিব আজিজ

এই যে দেশ সবুজ শ্যামল
পুকুর নদী জল
সব কিছু আমার মনে
জোগায় বাঁচার বল।

এই যে গাছে টিয়ে নাচে
ঘুঘু শোনায় গান
রাখাল বাজায় সুরে বাঁশি
শুনে জুড়ায় প্রাণ।

এই যে বিলে শাপলা ভাসে
ভাসে কলমিলতা
বাউল নেচে গান গায়
আবেগ ভরা কথা।

এই যে চাষির মুখে হাসি
সোনার ফসল ফলায়
কৃষাণ মেয়ে ফুল কুড়ায়
ভোরে গাছের তলায়।

এই যে গাঁয়ের পথের পাশে
কলা পাতা দোলে
তালের ডালে বাবুই পাখি
গানের সুর তোলে।

সপ্তম শ্রেণি, মিজমিজি পাইনাদী রেকমত আলী উচ্চ বিদ্যালয়, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

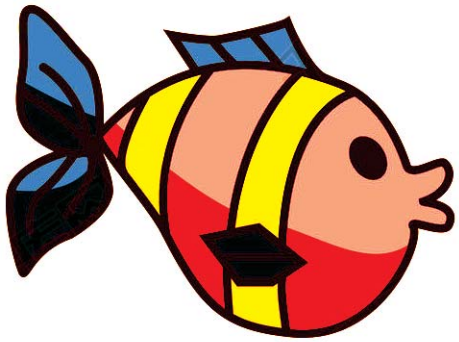

স্রোতের বন্ধু ঢেউয়ের মিতে

মোহাম্মদ মারুফুল

নদীর পাড়ে গলা পানির কাশের বনে
তুই যে খুবই করতি সাঁতার হাঁসের সনে।
আমিও সাঁতরাতাম তোরই সঙ্গে থেকে;
হাঁস-পাখিরা মাঝে মাঝে উঠত ডেকে।
সাদা সাদা কাশফুলেরা হেলতো দুলতো
তোর ও আমার মনে খুশি জাগিয়ে তুলত।
পানির তলায় খিলখিলাতি ডুব দিয়ে তুই
তোর সে হাসি তখন আমি বল কোথা থুই।
আমিও ভুড়ভুড়ি ছেড়ে পানির তলে-
হেসেছি খুব গড়িয়ে পড়ে হেলে দুলে।
কামরাঙা ঢেউ দিয়ে নদী সাজত যখন
মনে হতো নদী হেসে বাজত তখন।
কত যে মাছ তোর ও আমার আগে পাছে-
কাটতো সাঁতার; ভিড় জমাত আরো মাছে।
কত যে আনন্দ ছন্দ পানির ভাঁজে-
থাকত তা-ই ফুটত স্রোতের কারুকাজে।
স্রোতের ভেতর আমরা দু'সই; কিশোরীদ্বয়-
খেলতাম অনেক মজার খেলা না করে ভয়।
নদীর সঙ্গে পানির সঙ্গে মিতালিতে-
আমরা হতাম স্রোতের বন্ধু ঢেউয়ের মিতে।

মায়ের দেওয়া খাবার খাই, মনের আনন্দে স্কুলে যাই

জান্নাতে রোজী

বিদ্যালয়ে যেতে সক্ষম শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং ঝরে পড়া রোধে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২৪শে সেপ্টেম্বর পালিত হয় 'মীনা দিবস'। এবারের দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'মায়ের দেওয়া খাবার খাই, মনের আনন্দে স্কুলে যাই'। রাজধানীর মিরপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরেসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মীনা চরিত্র কন্যাশিশুদের একটি স্বপ্নের চরিত্র। যুগের পর যুগ মীনার বয়স ১০ বছরই আছে, আমরা তাকে বড়ো হতে দেবো না। কারণ মীনাকে এ বয়সেই মানায়। মীনা অপ্রতিরোধ্য, সে সব কন্যাশিশুর আদর্শ।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক)-এর ঘোষণা অনুযায়ী, প্রতি বছর ২৪শে সেপ্টেম্বর পালিত হয় মীনা দিবস। ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস ইমারজেন্সি ফান্ড (ইউনিসেফ)-এর সহযোগিতায় ১৯৮৯ সাল থেকে এ দিবসটি পালন শুরু হয় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র 'মীনা' কে অনুসরণ করে প্রাথমিক শিক্ষাসহ সামাজিক গণসচেতনমূলক কার্যক্রমে শিশু-কিশোর ও অভিভাবকদের আরো বেশি সম্পৃক্ত করতে প্রতি বছর বিপুল উৎসাহের সাথে বাংলাদেশে দিবসটি পালিত হয়।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস

প্রতি বছর দেশে ৩০শে সেপ্টেম্বর পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। কন্যাশিশুর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও তাদের প্রতি বৈষম্যহীন আচরণের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দিবসটি পালিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়- 'থাকলে কন্যা সুরক্ষিত, দেশ হবে আলোকিত'।

কন্যাশিশুর প্রতি জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য রোধে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু বিকাশের বিষয়টিকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ২০০০ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশু অধিকার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনকে কন্যাশিশু দিবস হিসেবে পালনের লক্ষ্যে ৩০ সেপ্টেম্বরকে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ঘোষণা দেয়। তখন থেকেই প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালিত হচ্ছে।

কন্যাশিশুর উন্নয়নে সব সময় সচেষ্ট থেকেছেন প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশেষ কিশোর সংগ্রাম আহমেদ কবীর তাই ভালোবেসে এঁকেছে প্রধানমন্ত্রীর এই ছবি।

কমিক্স

কিচ্ছু ভালো লাগে না!

আহসান হাবীব

তাহলে ফেসবুক কর...
ফেসবুক করতে তো ভালো লাগবেই।
না না না ফেসবুক করতেও ভালো লাগছে না!!
হুম... আচ্ছা একটু পিছনে তাকাতো
আহা তাকা না
কেন?
তাকালো। একটা বিরাট মাকড়সা দেয়ালে!
ওরে বাপরে!!
হা হা হা... তোর তাহলে মাকড়সা দেখে ভয় পেতে এখনো ভালো লাগে।

শরীরের যত্নে আমাদের দায়িত্ব

জাহিদুল ইসলাম

আহনাফ যখন চার-পাঁচ বছরের ছিল, তখন জামাকাপড় পরে ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়াতো বাবার মতো অফিসে যাওয়ার জন্য।

মাঝে মাঝে বাড়িতে মেহমান আসে, আবার কখনো কখনো আহনাফ তার বাবা-মায়ের সাথে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যায়। আহনাফ একেক দিন একেক বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য বাবা-মায়ের কাছে প্রশ্ন করতে থাকে। মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা, ফুফু, খালা, মামা, অন্যান্য ভাইবোন, প্রতিবেশী সবার কাছ থেকে নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জেনে জেনে শিখছে। এভাবেই সে তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের নামও শিখেছে। আহনাফের মতো করেই আমরা শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন- মাথা, মুখ, নাক, চোখ, কান, বুক, স্তন, পিঠ, হাত, পা, ত্বক, হাড়, কিডনি, যকৃত, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ইত্যাদির নাম ও কাজ সম্পর্কে জেনেছি। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে কোনটি আমাদের কীভাবে সাহায্য করে তা জানা এবং শরীর ভালো রাখার জন্য প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্ন করা প্রয়োজন। প্রতিটি মানুষেরই নিজের শরীর ও মন ভালো রাখার জন্য পুষ্টিকর খাবার, পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করা, ব্যায়াম, খেলাধুলা ও যথাযথ চিকিৎসা প্রয়োজন। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্ন নিলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে এবং নিয়ম মেনে চললে শরীর সুস্থ থাকে এবং শিশু-কিশোররা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে। শরীর ভালো থাকলে মনও ভালো থাকে।

হাতপায়ে ময়লা লাগলে ধুয়ে ফেলা এবং ধোয়ার পর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা, দাঁত পরিষ্কার করা, নিয়মিত গোসল করা, পরিষ্কার কাপড় পরা, শৌচকাজ করার পর সাবান/মাটি/ছাই দিয়ে হাত পরিষ্কার করা, হাত-পায়ের নখ ও মাথার চুল বড়ো হলে কেটে ফেলা, সাবান বা শ্যাম্পু ব্যবহার করে চুল পরিষ্কার রাখা, নিজের কাপড় নিজে পরিষ্কার করা, নিজের পড়ার টেবিল ও বিছানা গুছিয়ে রাখা, গৃহস্থালির কাজে মা-বাবা ও পরিবারকে সহযোগিতা করা, খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা, পরিমাণ মতো পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ও পর্যাপ্ত পানি পান করা ইত্যাদি কাজ করা সুস্থতার জন্য খুব দরকারি।

শরীরের যত্ন নাও, সুস্থ থাক। এমনটিই বলছে বিন্দি পুষ্পিকার আঁকা মিকি মাউস।

বিন্দি পড়ে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে, সপ্তম শ্রেণিতে

তবে সব ধরনের নিয়ম-কানুন মেনে চলার পরও শরীরে সমস্যা দেখা দিতে পারে। অতএব, যেভাবে বা যে কারণেই হোক শরীরে সমস্যার সৃষ্টি হলে তা যত দ্রুত সম্ভব বাবা-মা বা অভিভাবকদের সহায়তায় তা সমাধানের জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন।

বড়ো হয়ে উঠছে আহনাফ। পরিবারের সবার কাছ থেকে একটু একটু করে শিখে নিয়েছে কীভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের যত্ন নিতে হয়।

অটিজম, বুদ্ধি, বাক, দৃষ্টি ও বহুমাত্রিক বিশেষ শিশুরা নিজে নিজের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের যত্ন নিতে পারে না এবং বড়োদের কাছ থেকে সহযোগিতাও চাইতে পারে না। এজন্য বাবা-মা, অভিভাবক, পরিচর্যাকারী

ও পরিবারের অন্য সদস্যদের দায়িত্ব নিয়ে তাদের শরীরের যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া বিশেষ শিশুদের শরীরের যত্নের ক্ষেত্রে তাদেরকে উপযোগী করে তথ্য দিতে হবে, যাতে তারাও মা-বাবা ও অভিভাবকদের কাছে তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের যত্নের জন্য সহযোগিতার কথা বলতে এবং বিভিন্ন সমস্যার কথা তাদের মতো করে বলতে বা বোঝাতে পারে।

জন্ম, সৃষ্টি, বেড়ে ওঠা, বড়ো হওয়া এ শব্দগুলো আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। আহনাফও এসব শব্দ বড়োদের আলোচনার মধ্যে শুনে শুনে বেড়ে উঠছে। কিন্তু সবকিছুর অর্থ বুঝতে পারে না ও। একদিন সে বাবার কাছে জানতে চেয়েছিল, আচ্ছা বাবা, আমি মায়ের পেটের ভিতরে কোথায় ছিলাম? তারপর একা একাই বলতে থাকে, আমরা খাবার খাওয়ার পর পেটে যেখানে খাবার থাকে আমি কি সেখানেই ছিলাম?

বাবা বুঝতে পারেন ছেলে বড়ো হচ্ছে তাকে আরো তথ্য দিতে হবে। তিনি বলেন, মায়ের পেটের ভিতরে একটি থলে আছে যেখানে শিশুরা একটু একটু করে বড়ো হতে থাকে। এই থলেটি শুধু মায়েদেরই থাকে। এই থলেটির নাম হচ্ছে জরায়ু। তুমি তোমার মায়ের পেটের ভিতরে জরায়ুতে আস্তে আস্তে বড়ো হয়েছ, আবার আমিও আমার মায়ের জরায়ুতেই বড়ো হয়েছি। এটিও আমাদের শরীরেরই একটি অংশ।

এরপর বাবা বলেন, আমাদের দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে যে অঙ্গটি থাকে তাকে বলা হয় যৌনাঙ্গ। এ অঙ্গের মাধ্যমে আমাদের শরীরের দূষিত পানি প্রস্রাব হিসেবে বের হয়ে যায়। কাজেই গোসলের সময় বা প্রস্রাবের পর পানি ব্যবহার করে এ অঙ্গটি পরিষ্কার রাখা উচিত। শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যই আমাদের এসব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

শিশুর বিকাশ ও বেড়ে ওঠা

মায়ার মা ভীষণ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি ডায়াবেটিক রোগে ভুগছেন। তার পায়ে ঘা হয়ে পচন ধরে গেছে, অপারেশন করতে হবে। মায়ার বড়ো বোন চাকরির কারণে হাসপাতালে থাকতে পারে না। কাজেই ১৩ বছর বয়সি মায়াকেই মায়ের সাথে হাসপাতালে থাকতে হচ্ছে।

আহনাফের বাবা মায়ার সেজো মামা। আহনাফ তার বাবা-মায়ের সাথে বড়ো ফুপুকে (মায়ার মা) দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিল। হাসপাতালে গিয়ে আহনাফ তার মায়া আপুর সাথে গল্প করতে চায়। কিন্তু মায়া যেন কোনোভাবেই আহনাফের সাথে কথা বলতে ভালো বোধ করছিল না। প্রথমে মনে হচ্ছিল হয়ত মায়ের অসুস্থতার কারণেই এমন আচরণ করছে। কিছুক্ষণ পর জানা গেল হাসপাতালে মায়ের সাথে থাকাকালীন সময়েই তার ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালে গোপনীয়তা রক্ষা করে পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যবস্থা নেই। এদিকে তার স্যানিটারি ন্যাপকিন কেনা দরকার কিন্তু অপরিচিত জায়গা বলে নিজেও কিনতে লজ্জা পাচ্ছে এবং মামাকে কিনতে দিতেও লজ্জা পাচ্ছিল।

মামা পরিস্থিতি বুঝে তাকে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনে দিয়ে আসলেন এবং সে যাতে হাসপাতালে সঠিকভাবে পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ দিলেন। মামা মায়াকে স্বাভাবিক করার প্রয়োজনে ইচ্ছে করেই তার বোন ও মায়ার সাথে কিছুটা বেশি সময় কাটালেন। গল্প করতে করতেই মায়া ও আহনাফকে বললেন, আমরা সবাই ছোটো ছিলাম এবং ধীরে ধীরে আমাদের বিভিন্ন বিকাশের মধ্যদিয়ে সবাই বড়ো হয়েছি। তুমি যে কারণে লজ্জা পাচ্ছ সেটিও একটি ইতিবাচক পরিবর্তন বা বিকাশ। কাজেই এসময় স্বাভাবিক থেকে নিজেকে সবকাজে মনোযোগী হতে হবে।

মামা বলেন, আসলে বিকাশ শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি, বর্ধন, ইতিবাচক পরিবর্তন এবং একটি চলমান প্রক্রিয়া। মানব শিশু ভ্রূণ অবস্থা থেকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে। জন্মের পর থেকেই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে উন্নত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে উঠবে। প্রত্যেক শিশুরই শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগীয় ও নৈতিক বিকাশ ঘটে। এ বিকাশ তোমাদের ঠিকভাবে হচ্ছে বলেই তোমরা বড়ো হচ্ছ, তোমাদের শরীরের পরিবর্তন হচ্ছে, মনের পরিবর্তন হচ্ছে, সবার সাথে কথা বলতে বা যোগাযোগ করতে পারছ।

আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আবেগ, অনুভূতি, শেখার আগ্রহ এবং বুদ্ধিও বেড়েছে। যা আমরা একজন ছোটো শিশুর সাথে প্রাপ্ত

বয়স্কদের আচরণের তুলনা করলেই বুঝতে পারি। শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির সাথে সাথে মানসিক বিকাশও ঘটে। শিশুর মানসিক বিকাশের ফলে শিশুর মধ্যে চিন্তাশক্তি, মনোযোগ, একাগ্রতা, যে-কোনো কিছুর কারণ সম্পর্কে ধারণা, সমস্যা সমাধানের শক্তি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। এ আলোচনা করতে করতে মায়া কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আহনাফের সাথে গল্প করতে শুরু করে।

অটিজম, বুদ্ধি, বাক, দৃষ্টি ও বহুমাত্রিক বিশেষ শিশুরা নিজে নিজের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের যত্ন নিতে পারে না এবং বড়োদের কাছ থেকে সহযোগিতাও চাইতে পারে না।

কিছুক্ষণ পর হাসপাতালের নার্স এসে জানায় আজকের মতো রোগীর সাথে সাক্ষাতের সময় শেষ। মামা মায়াকে বলেন, মায়ের অপারেশন শেষে বাসায় ফিরে আবার আমরা গল্প করব।

মামা বাড়িতে মায়ার কয়েকদিন

মায়ার মা অপারেশনের পর অনেকটাই সুস্থ। কিন্তু ডাক্তারের ফলোআপে থাকার জন্য তারা এখন আহনাফদের বাসায়। মায়ের সাথে থাকায় মায়ার বেশ কয়েকদিন স্কুলে যাওয়া হচ্ছে না, এজন্য অবশ্য তার একটু মন খারাপ। কিন্তু আহনাফ ও মামা-মামির সাথে গল্প করে আনন্দেই কাটছে মায়ার সময়।

এরমধ্যে একদিন আহনাফের বাবা বাসায় আসার সাথে সাথে মায়া বলতে থাকে, জানো মামা, আহনাফ আজকে তোমার সেভিং ফোম মেখে দাড়ি শেভ করার চেষ্টা করছিল। মামা হাসতে হাসতে বলেন, ওর তো এখনো দাড়ি'ই উঠেনি। ঠিক আছে, আজকে তোমাদের সেদিনের মতো বড়ো হওয়া বা বিকাশের গল্প বলব।

প্রত্যেক শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি তাদের সামাজিক আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন তোমরা শারীরিকভাবে বড়ো হচ্ছ তেমনি অন্যদের সাথে ভালোভাবে মেলামেশা করতে পারছ। আসলে তোমরা এই যে ধীরে ধীরে বড়ো হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক রীতিনীতি শিখছ, কুশল বিনিময় করছ, দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছ, নিজের ইচ্ছেমতো যা খুশি তাই করছ না (আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা), সমাজের প্রতি তোমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছ, সমবয়সিদের সাথে খেলাধুলা করছ এগুলোই শিশুর সামাজিক বিকাশ। শিশুরা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের সাথে সাথে তাদের মধ্যে ভাষাগত, আবেগীয় ও নৈতিক বিকাশও ঘটতে থাকে। শিশুর মধ্যে কথা বলা শেখার সাথে সাথে কীভাবে কার সাথে কথা বলতে হবে, কথার যৌক্তিকতা তুলে ধরা; সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, আহলাদ প্রকাশ করার মতো আবেগীয়তা এবং ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বুঝতে পারার মতো নৈতিকতার বিকাশও ঘটতে থাকে।

মামা বলেন, শিশুরা বড়ো হতে হতে একটি সময় হঠাৎ খুব দ্রুতগতিতে কতগুলো পরিবর্তন হয়। দ্রুত পরিবর্তন হয় বলে অনেকেই সে অবস্থা মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে না। যেমন তোমরা দু'জনেই এখন সেই পরিবর্তনের সময়ের মধ্যে আছ। এসময় অনেকেই নিজেকে বয়সের তুলনায় অনেক বড়ো মনে করে এবং বড়োদের মতো কাজ করার চেষ্টা করে।

মায়া হেসে বলে, এখন বুঝতে পেরেছি এজন্যই আহনাফ আজকে দাড়ি শেভ করার চেষ্টা করছিল।

আহনাফ একটু লজ্জা পায়। ওর বাবা বললেন, এখন তোমাদের যে বয়স শুরু হয়েছে এটিই হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোরকাল। এসময় শৈশবকালের শেষ পর্যায় থেকে ছেলে এবং মেয়েশিশুর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে শুরু করে। বয়ঃসন্ধি সময়টা ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের আগে শুরু হয়। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে আগে বা পরে বয়ঃসন্ধি শুরু হতে পারে।

মায়ার মামিও বলেন, এই প্রক্রিয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এ সময় অহেতুক লজ্জা পাওয়া একদম ঠিক না। এই দেখ সেদিন হাসপাতালে মায়া যদি ওর সমস্যার কথা খুলে না বলত তাহলে ওকে সহযোগিতা করার সুযোগই পাওয়া যেত না। নিজেদের কী কী পরিবর্তন হবে, পরিবর্তনের ফলে কোনো সমস্যা হয় কিনা, সমস্যা হলে কীভাবে কার সাহায্য নিয়ে সমস্যা সমাধান করবে সে তথ্য জানা থাকলেই বরং ভালো।

মামা বলেন, তুমি ঠিকই বলেছ। মানুষের কাছে সঠিক তথ্য থাকলে যে-কোনো মানুষই সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। বয়ঃসন্ধিতে হঠাৎ করেই শুরু হওয়া পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে উঠতে শিশুটিকে অনেক বেগ পেতে হয়। পরিবার ও সমাজ তার এই হঠাৎ পরিবর্তনকে মেনে নিতে সময় নেয়। না ছোটো না বড়ো- ফলে কিছু সময়ের জন্য একাকী হয়ে পড়ে এবং যে-কোনো অসামাজিক কাজে জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। এ সময় একটু সচেতন থাকলেই কোনো সমস্যা হয় না।

বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক বিকাশের কারণেই এখন তোমাদের বিভিন্ন সৃজনশীল ও দলীয় কাজে বন্ধুদের সাথে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছে করবে; নিজেকে বড়ো বড়ো মনে হবে, গোপনীয়তা বৃদ্ধি পাবে, নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, সাজতে পছন্দ করা ও ফ্যাশনের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে; আবার কেউ কেউ বিষণ্নতায় ভোগে ও অমনোযোগী হয়ে যায়, চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে, নিজেকে একা বা অসহায় মনে করে, ভয়, লজ্জা ও সংকোচ সৃষ্টি হতে পারে, কারো কারো মিথ্যা বলার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, আবেগ প্রবণতা বেড়ে যায়, শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে কোন ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে তা না জানার কারণে সমস্যা সমাধানের কোনো প্রস্তুতি থাকে না। ফলে বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দেয়।

সবার সমস্যা কিন্তু একই ধরনের নয়। একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম সমস্যা হতে পারে। যেমন- অনেক মেয়েই প্রথম ঋতুস্রাব শুরু হলে ভয় পেয়ে যায়, কারো কারো এ সময় পেট ব্যথা হয়, স্যানিটারি ন্যাপকিন বা কাপড় ব্যবহার করা না জানার কারণে লজ্জায় পরতে হয়। আবার শরীরের বিভিন্ন স্থানের লোম কীভাবে পরিষ্কার করতে হবে তা না জানার কারণে সমস্যা হয়, কেউ কেউ পুরাতন, অপরিষ্কার ব্লেড বা রেজার ব্যবহার করতে গিয়ে সমস্যায় পরে। ছেলেরা শেভ করার উপকরণ কেনার কথা বাসায় বলতে লজ্জা পায় আবার সেলুনে গিয়ে শেভ করতে অস্বস্তি বোধ করে, হঠাৎ স্বপ্নদোষ হওয়া শুরু হলে লজ্জায় কাউকে বলতে পারে না, সমবয়সিদের সাথে কখনো কখনো আলোচনা করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য পায় না, কারো কারো লিঙ্গ স্বাভাবিকভাবে বড়ো হয় না। কিন্তু এ কথা কাউকে বলতে বা চিকিৎসা করাতেও লজ্জা পায়। কোনো কোনো মেয়েদের স্তন স্বাভাবিকভাবে বড়ো হয় না, কেউ কেউ হঠাৎ ভীষণ মোটা হয়ে যায়, কোনো কোনো মেয়ের সবসময় সাদা স্রাব বের হতে থাকে, প্রায় সব ছেলে-মেয়েরাই বিশেষত ছেলেদের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হওয়ায় সবার সামনে যেতে অস্বস্তি বোধ করে, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে এবং এ বয়সে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে না জানার কারণে প্রেমে পড়ে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়। আবার অটিজম, বুদ্ধি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে কেউ কেউ আক্রমণাত্নক হয়ে উঠে ও শরীরে কাপড় রাখতে বা কাপড় পরতে চায় না।

বাবার আলোচনা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনে আহনাফ বলে, বাবা এত সমস্যা থাকলে আমরা বড়ো হব কী করে। বাবা, তুমি কিন্তু আমাকে সাহায্য করবে যাতে আমি কোনো সমস্যায় না পড়ি। আর আমার কোনো সমস্যা হলেই আমি তোমাদের বলে দিব।

আহনাফের বাবা বলেন, আমি তো তোমাকে সাহায্য করবই বাবা। সব মা-বাবারই উচিত তাদের ছেলে-মেয়েদের এ সময়ে সহযোগিতা করা। ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমরা এখন এ সমস্যাগুলো কীভাবে দূর করতে পারি সে উপায়গুলো জেনে নিব তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো হচ্ছে-

- বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন স্বাভাবিক ও ইতিবাচক। এ বিষয়টি পবিবারের সবাইকে বিশ্বাস করতে হবে।

- কোনো সমস্যা হলে দ্রুততম সময়ে বাবা-মা বা বিশ্বস্ত বড়োদের সাথে আলোচনা করতে হবে।
- কিশোর-কিশোরীদের সাথে পরিবারের সদস্যদের বিশেষত মা-বাবাকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। ওরা যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান, আবেগীয় ও মানসিক চাপে টিকে থাকতে পারে এবং সব ধরনের পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারে।
- মা-বাবা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো শুরু হওয়ার আগেই কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী তথ্যের মাধ্যমে এ বিষয়ে ইতিবাচক ধারণা প্রদান করতে হবে।
- বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করার জন্য পরিবার, কমিউনিটি, স্কুল/ কলেজ, খেলার জায়গাসহ সকল জায়গায় ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
- পরামর্শের মাধ্যমে যেসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী শিশুরা তাদের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো সঠিকভাবে বুঝতে ও বলতে পারে না। এজন্য পরিবারের সদস্যদেরই তাদের এ পরিবর্তন এবং পরিবর্তনকালীন সময়ের সমস্যা সমাধানের বিকল্প পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে ও নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের সমস্যাগুলো সহজে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ বা প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনে অভিভাবকদের মনোঃসামাজিক সেবা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজন হলে কিশোর-কিশোরীদেরও মনোঃসামাজিক সেবা প্রদান করতে হবে। মূলত অভিভাবক ও কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

মামার সব কথা শুনে মায়া বলল- মামা আমি এখন আর কোনো সমস্যায় পড়ব না। যখনি কোনো সমস্যা দেখা দিবে তখনি আম্মুকে জানাব। তাছাড়া তুমি আর মামি তো রয়েছই। তবে আমার সব বন্ধুদের এ কথাগুলো জানাতে হবে, কারণ অনেকেই আমার মতো সমস্যায় পড়ে কিন্তু কাউকে বলতে পারে না। আসলে সচেতন হলেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

বিন্নি হিমিকা-এর আঁকা এক বেড়ালের মুখে হাসি, আরেক বেড়াল কাঁদছে কেন, জানো তুমি?

বিন্নি পড়ে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে, সপ্তম শ্রেণিতে

বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর কৈশোর

কিছু না বোঝার কাল

রাবেয়া ফেরদৌস

আজ অন্তর জন্মদিন। অন্ত আজ থেকে ১২ বছরে পা দিল। ইদানীং অন্তর কী যেন হয়েছে। তাই বাসায় কোনো ধরনের অনুষ্ঠান রাখা হয়নি। শুধুমাত্র অন্তর জন্য ওর মা ওর পছন্দের কিছু খাবার তৈরি করেছে। এই তালিকায় রয়েছে পোলাও, রোস্ট, গরুর ঝাল মাংস আর বোরহানি। সবকিছু মা করেছে অন্তর জন্য। কিন্তু অন্তর মন কিছুদিন ধরেই ভালো না। সবার সাথে কেমন যেন উলটাপালটা আচরণ করে। এই যেমন অন্যান্য দিন এই খাবারগুলো পেলে অন্ত মনের আনন্দে সারাদিন ধরে খেত। কিন্তু আজ দুপুরে কোনোমতে খেয়েছে। খাওয়া শেষ না করেই উঠে চলে গেছে।

অন্ত শারীরিক প্রতিবন্ধী। জন্মলগ্ন থেকেই সে সেরিব্রাল পালসি নামক মস্তিষ্কের প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত। এ কারণে তার শরীরের ডান পাশের হাত ও পায়ের শক্তি কম। তাই মা ভাবল বড়ো হওয়ার সাথে সাথে এই ব্যাপারগুলো বুঝতে পেরেই হয়ত মন খারাপ থাকে।

অন্তর মেজাজ দিনে দিনে আরো খিটখিটে হয়ে পড়ছে। যে কারণে অন্তর বাবা-মার চিন্তার সীমা নেই। এমনিতেই মেয়েটা প্রতিবন্ধী। যাও ভালো ছিল কিন্তু এখন কী যেন হলো তার। কখনো জোরে জোরে কান্না করে আবার কখনো হাসে। কারো সাথেই অন্ত তেমন একটা কথা বলে না। শুধু দরজা লাগিয়ে কী যেন চিন্তা করে।

পরের দিন বিকেলবেলা অন্তর আম্মু বাইরে হাঁটতে বের হলেন। দেখলেন বিকেলটা অনেক সুন্দর। আকাশটা হালকা লাল, নীল আর সাদা রঙে ভরে গেছে। বাইরে পাখির কলরবে আর অন্তর লাগানো বাড়ির উঠানে হাসনাহেনা ফুলের গন্ধে পরিবেশটা মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছে। অন্তর মা অন্তকে বাইরে থেকে ডাকল অন্ত দেখে যা বাইরে কী সুন্দর দৃশ্য! অন্ত কানেই নিল না মায়ের কথা। অন্তর মা খুব মন খারাপ করল। কী হলো মেয়েটার। দিনে দিনে ওর এ অবস্থা কেন হলো ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

অন্তর প্রিয় বান্ধবী নুবাহ্। নুবাহ্ এর সাথে অন্তর অনেক ভাব। তাই অন্তর মা নুবাহ্কে ফোন করে বাড়িতে নিয়ে আসল। নুবাহ্ অন্তর রুমের দরজা

অনেকবার ধাক্কাধাক্কি করল। ভিতর থেকে শুধু শোনা গেল, নুবাহ্ তুই বাসায় চলে যা, আমার কিছুই ভাল্লাগছে না। আমি বের হবো না।

নুবাহ্ খুব অবাকই হলো। অন্ত কখনো নুবাহ্ এর সাথে এই ধরনের আচরণ করে না। সেই ছোটবেলার বন্ধু তারা। সুখে-দুঃখে কত সময় কাটিয়েছে। কিন্তু

এখন অন্তর কী যে হলো বুঝতে পারছে না কেউই। খুবই চিন্তার বিষয়। অন্তর বাবা-মা দুইজনই খুব চিন্তিত। বাবা-মা অন্তর বড়ো বোন বিথীকাকে এই বিষয়টি জানাল।

পরের দিন সকালবেলা। অন্তর বাবা-মা দুইজনই সিদ্ধান্ত নিলো অন্তকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে। অন্তকে প্রতি মাসে একবার করে ঢাকায় অবস্থিত নিউরোসাইন্স হাসপাতালে শিশু নিউরোলজিস্ট ও অকুপেশেনাল থেরাপিস্ট এবং ফিজিওথেরাপিস্ট এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

যথারীতি ঢাকার নিউরোসাইন্স হাসপাতালে নিয়ে গেল। এখানে এসে প্রথমে অন্তকে শিশু নিউরোলজিস্টকে দেখানো হলো। ডাক্তার অন্তকে ভালো করে চেকআপ করলেন। বললেন, অন্তর এখন বয়ঃসন্ধিকাল চলছে। এই সময়ে শরীরে হরমোনাল পরিবর্তনগুলো হয়। যে কারণে ছেলে-মেয়েদের একাধারে দৈহিক ও মানসিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। ভয়ের কিছু নেই। এজন্য দরকার পরিবারের সঙ্গ।

অন্তর মতো একই সমস্যা নিয়ে এসেছে দীপ্ত। দীপ্ত অটিজম নামক নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত। ওর বয়স ১৬ বছর। দীপ্তর মা অন্তর মাকে বলল, ইদানীং ছেলেটা অনেক অস্থির থাকে। কারো কথাই শুনতে চায় না। যে কারণে ওর পরিবার ওকে নিয়ে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে পারে না।

ডাক্তার বললেন যেহেতু সে স্বাভাবিক শিশু নয় তাই সে তার অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পারছে না। যে কারণে তার অস্বাভাবিক আচরণ বেড়ে গিয়েছে। দীপ্তর পরিবারকেও ডাক্তার এই সময়ে ওর সাথে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

অন্ত ইদানীং হাত ও পায়ের শক্তি কম পাচ্ছে। লিখতে গেলেও সমস্যা হচ্ছে। তাই ডাক্তারের রুম থেকে কাজ শেষ করে তারা অকুপেশনাল থেরাপিস্ট ম্যাডামের কাছে গেল অকুপেশনাল থেরাপি নিতে। এটি এমন একটি থেরাপি যা রোগীর শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতাকে কাজে পরিণত করে রোগীকে তার দৈনন্দিন কাজে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী করে তোলে। অকুপেশনাল থেরাপি নিয়েই অন্ত এখন নিজের কাজ যেমন: খাওয়াদাওয়া, গোসল করা, জামাকাপড় পরা, স্কুলে যাওয়া, ডান হাত দিয়ে লিখা ইত্যাদি নিজে নিজে করতে পারে। অকুপেশনাল থেরাপিস্ট ম্যাডাম অন্তকে অনেক আদর করে। এবার ম্যাডাম ওকে দেখেই বুঝতে পেরেছে কোনো সমস্যা। হাতের লিখার থেরাপিগুলো ম্যাডাম কিছুটা পরিবর্তন করে দিলেন। এছাড়াও পূর্বের দেওয়া অকুপেশনাল থেরাপিগুলো নিয়মিত করতে বলেছেন। অন্তর মন খারাপের কারণ জানতে চাইলেন অন্তর মায়ের কাছে। যখন ওর সমস্যার কথা শুনতে পেলেন তখন অন্তকে বাইরে রেখে অন্তর মায়ের সাথে কথা বললেন। বলেন প্রথমেই অন্তর বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে কাউন্সেলিং দরকার। অন্তর সাথে সবসময় ভালো আচরণ করতে হবে। তাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সর্বোপরি অন্তকে বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।

অকুপেশনাল থেরাপিস্ট ম্যাডামের কথা শুনে অন্তর মা কিছুটা আস্বস্ত হলো। কিন্তু অন্তকে বোঝানোর ক্ষমতা থাকলে একমাত্র বড়ো বোনেরই আছে। তার কথা অন্ত মন দিয়ে শুনে। বড়ো আপু মানে বিথীকা আপুকে অন্ত অনেক বেশি পছন্দ করে। তাই বাড়িতে

যাওয়ার সময় ঢাকা থেকে অন্তর বোনকেও বাড়িতে নেওয়া হলো। অন্তর ভাগনি বিন্দু এখন হাঁটতে পারে। অন্তকে আন্টি ডাকতে পারে। বোন আর ভাগনেকে দেখে অন্তর মন কিছুটা ভালো হলো।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। আজকের বিকেলটা অন্যদিনের মতো সুন্দর না। আকাশে কেমন মেঘ করেছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। যদিও বৃষ্টির দেখা নেই। মা সবার জন্য পিঠা তৈরি করছে।

অন্তর বোন গল্পের ছলেই অন্তর সাথে কথা বলল। বলল শোন অন্ত তোর যে বয়স আমিও এই সময় এই বয়সটা পার করেছি। আমারও শুরুর দিকে অনেক কষ্ট হয়েছে সবকিছুর সাথে মানিয়ে নিতে। অন্ত হঠাৎ অবাক সুরে বলল, তাই আপু?

এরপর অন্তু গড়গড় করে বলতে লাগল, ওর কত রকমের সমস্যা হচ্ছে। তখন বড়ো আপু ওকে সব বুঝিয়ে বললেন। খুশিতে অন্ত বোনকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি হয়ত নিজেও জানো না আমাকে তুমি কত উপকার করলে।

সবাই আসলো পিঠা খেতে। নুবাহ্‌কেও বলেছিল অন্তর আম্মু। নুবাহ্ আর অন্তর চোখাচোখি হতেই অন্ত নুবাহ্‌কে সরি বলল। বলল দোস্ত আর তোর সাথে আমি খারাপ ব্যবহার করব না। নুবাহ্ হেসে অন্তকে জড়িয়ে ধরল।

পরেরদিন সকালবেলা। অন্ত সবাইকে ঘুম থেকে ডাক দিলো। আজ সে মায়ের সাথে সবার জন্য সকালের নাশতা তৈরি করেছে। পরোটা আর আপুর আনা রসগোল্লা। সবাই বেশ তৃপ্তি করেই খেলো। অন্তর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য সবাই বেশ খুশি। আসুন আমরা স্বাভাবিক শিশুদের মতো এসব অন্তদের পাশে দাঁড়াই যাতে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে।

যার সব কাজ তোমাকে অনুপ্রাণিত করে তোমাকে সাহস জোগায়, বড়ো হয়ে তুমি যার মতো হতে চাও, হতে পারেন তিনি এমন কেউ যাকে বিশ্বের সবাই চেনে, হতে পারে তাকে কেউ চেনে না কেবল তুমি ছাড়া। হতে পারে তোমার সুপারহিরো কল্পনার কেউ, অথবা বাস্তবের। কেন তুমি তাকে সুপারহিরো মনে করছ, সেটাই হলো আসল কথা।

কে তোমার সুপারহিরো?

সেই আসল কথাসহ তোমার সুপারহিরো সম্বন্ধে ২০০ শব্দের ভেতর লিখে আগামী ৩০ নভেম্বরের ভেতর জানাও নবারুণকে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-
editornobarun@dfp.gov.bd

ডাকে পাঠাতে চাইলে ঠিকানাঃ
সম্পাদক, নবারুণ,
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,
১১২, সার্কিট হাউজ রোড।
ঢাকা-১০০০।

টিনএজের ৮টি ব্যায়াম

নূহু আব্দুল্লাহ

শ্রেণিকক্ষে লম্বা সময়! বন্ধুদের সময় দেওয়া! পড়ার চাপ মাথায়! শারীরিক, মানসিক নানা পরিবর্তনের চাপ! চেহারার সৌন্দর্যের চিন্তা! মুখে ব্রণ ওঠার যন্ত্রণা! ঘুম কম হওয়া! উফ! এতসব চাপ কী সামলানো যায় এ বয়সে!

যায়।

প্রতিদিন অনেক ব্যস্ততার মাঝেও অন্তত আধা ঘণ্টা সময় নিজের জন্য রাখতে হবে। তাহলেই হবে।

কী করতে হবে?

এই আধা ঘণ্টায় সহজ কিছু ব্যায়াম করতে হবে। বেশি নয় মাত্র ৮টি।

এই ব্যায়ামগুলো এই বয়সে শারীরিক শক্তি সক্ষমতাকে ধরে রাখার পাশাপাশি মনের শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং শরীরের ও মনের অনেক সমস্যা দূর করবে।

তাহলে একটু দেখে নেওয়া যাক ব্যায়ামগুলো:

ডিপস/ নিচের দিকে ঝোঁক:

১. একটি চেয়ারের কিনারে নিজেকে বসিয়ে দুই হাতের তালু রাখতে হবে চেয়ারের ওপর।

২. এরপর নিজের শরীরের ভর দুই হাতের ওপর দিয়ে ধীরে শরীরকে নিচের দিকে নামিয়ে নিতে হবে।

এভাবে কয়েকবার করতে হবে।

৩. এ সময় দুই পায়ের ওপর শরীরের ভর থাকবে তবে তার ভাগ হাতের ওপর থাকা চাপের সমান হবে।

৪. কনুই যতটুকু চাপ নিতে পারে সে পর্যন্ত যাওয়ার পর ওপরের দিকে উঠতে হবে।

সাইড লেগরাইজ/ পা পাশে তোলা:

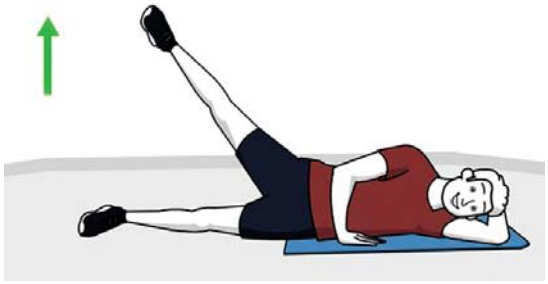

১. একটি মাদুরের ওপর শুয়ে পড়তে হবে এক পাশে কাৎ হয়ে। বাম পা থাকবে ডান পায়ের নিচে। দুই পা সোজা থাকবে। বা দিকে শুলে বা হাতের তালু মাদুরের ওপর নিজের সুবিধামতো এমনভাবে রাখতে হবে যাতে শরীরের ভারসাম্য বজায় থাকে। ডান হাত থাকবে সামনের দিকে মেঝের সঙ্গে।

২. এবার ডান পা ওপরের দিকে তুলতে হবে ধীরে ধীরে। তারপর আবার সোজা নামাতে হবে।

এভাবে কয়েকবার করতে হবে।

৩. একইভাবে বিপরীত দিকে কয়েকভাবে করতে হবে।

জাম্পিং লাংস/ ফুসফুস লাফানো

১. শুরু করতে হবে একটি পায়ের হাঁটু মেঝেতে ঠেকিয়ে। অন্য পা-টি থাকবে সামনের দিকে। দুই হাঁটুই ভাজ থাকবে।

২. হাত দুটো দুদিকে ছড়ানো থাকতে পারে। কিংবা থাকতে পারে কোমরের সঙ্গে। যেভাবে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা সুবিধা হয়।

৩. এবার আকাশের দিকে ঝাঁপ দিতে হবে। নামার সময় পায়ের অবস্থার পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ ঝাঁপ দেওয়ার আগে বাম পা নিচে থাকলে ঝাঁপ দেওয়ার পর ডান পা নিচে থাকবে।

৪. এবার আবার ঝাঁপ দিতে হবে। পায়ের অবস্থান আবার পরিবর্তন হবে নামার সময়।

উবু হওয়া

১. হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

২. হাঁটু ভাঁজ করে শরীর নিচের দিকে নামাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে হাঁটু পুরোপুরি ভাঁজ না হয়। তার আগেই আবার ওপরের দিকে উঠতে হবে।

এভাবে কয়েকবার করতে হবে।

জাম্পরোপ/ দড়িঝাঁপ

দুই হাতে দড়ির মাথা ধরে পায়ের নিচ দিয়ে বের করে নিতে হবে। পায়ের নিচ দিয়ে বের করে নেওয়ার সময় অবশ্যই ঝাঁপ দিতে হবে। যাতে দড়ি পায়ে আটকে না যায়। একটি ছন্দ বজায় রেখে এটি করতে হবে যতবার সম্ভব।

এক পা উত্তোলন

১. একটি মাদুরের ওপর দুই হাতের কনুই ও দুই পায়ের আঙুলের ওপর শরীরের ভর রাখতে হবে।

২. এক পা উত্তোলন করতে হবে ধীরে ধীরে। তারপর নামিয়ে আনতে হবে।

৩. এবার অন্য পা উত্তোলন করতে হবে ধীরে ধীরে। তারপর নামিয়ে আনতে হবে।

এভাবে কয়েকবার করতে হবে।

ওয়েটেড শোল্ডার প্রেস/ কাঁধের ভার বহন

১. দুই থেকে তিন পাউন্ড ওজন প্রতি হাতে এমনভাবে ধরতে হবে যেন দুই হাতে দুটি কোন আইসক্রিম ধরা আছে।

২. এভাবে একবার ওপরে তুলতে হবে

৩. একবার নিচে নামাতে হবে।

এভাবে কয়েকবার করতে হবে।

'ভি' সিট অ্যান্ড টুইস্ট 'ভি' এর মতো বসে মোড়ানো

১. একটি মাদুর বা নরম কিছুর ওপর পা সোজা করে বসতে হবে।

২. এবার হাঁটু ভাঁজ করে বসতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে শরীর 'ভি' এর মতো থাকে হাঁটুর সঙ্গে।

৩. এবার ডান হাত শরীরের বাঁ দিকে নিতে হবে। মেঝে স্পর্শ করতে হবে।

৪. একইভাবে বাম হাত শরীরের ডানদিকে নিতে হবে। মেঝে স্পর্শ করতে হবে।

ব্যায়ামগুলো শরীরের মাংসপেশি উন্নত করা, শরীরের বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তির ক্ষেত্রেও কাজ করবে। শরীরে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাবে। ফলে ব্রণ দূর হবে। শরীরে প্রয়োজনীয় এডিনোসিন তৈরি হবে। এতে ঘুম ভালো হবে। মানসিক চাপ মুক্ত থাকবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রয়োজনমতো পানি অবশ্যই পান করা হয়।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কী ঘটেছিল?

ধারাবাহিক গল্প

মুক্তিযুদ্ধের দিন-রাত্রি

আবুল কালাম আজাদ

Millions of babies
watching the skies
Bellies swollen,
with big round eyes
On Jessore Road-long
bamboo huts
No place to shit but sand channel ruts
Millions of fathers in rain
Millions of mothers in pain
Millions of brothers in woe
Millions of sisters nowhere to go
One Million aunts are dying for bread
One Million uncles lamenting the dead
Grandfather millions homeless and sad
Grandmother millions silently mad

বড়ো চাচা এইটুকু আবৃত্তি করে থেমে গেলেন। আমরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে। আবৃত্তিটা আমাদের ভালো লেগেছে। ইংরেজি হলেও অনেকটা বুঝতে পেরেছি। কথাগুলো মন ছুঁয়ে গেছে।

বড়ো চাচা বললেন, কবিতাটির নাম 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'। কবি হলেন অ্যালেন গিন্সবার্গ। তিনি একজন আমেরিকান কবি। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কলকাতা এসেছিলেন পশ্চিম বাংলার কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায় তখন।

পূর্ব বাংলা থেকে কলকাতা যাওয়ার পথ হলো যশোর রোড। শরণার্থীরা ছুটছে কলকাতায়। কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ এসেছিলেন সেই যশোর রোড পরিদর্শনে। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন তার সাথে।

শরণার্থীদের মানবেতর জীবন দেখে গিন্সবার্গের হৃদয় কেঁদে উঠে। তিনি লেখেন এই হৃদয়স্পর্শী কবিতাটি। এটা দীর্ঘ এক কবিতা। তিনি গান হিসেবে গাওয়ার জন্য এটির সুরও করেছিলেন। ফিরে গিয়ে বব ডিলান, জর্জ হ্যারিসন এবং আরো অনেকের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামে একটি কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন। সেই কনসার্টে এই গান গাওয়া হয়েছিল। আমি সেখান থেকে একটু পড়লাম মাত্র। নিশ্চয়ই তোমরা এইটুকুর অর্থ ধরতে পেরেছ। তারপরও আমি বাংলা অনুবাদ পড়ছি।

সেপ্টেম্বর হায় একাত্তর,
গরুগাড়ি কাদা রাস্তা পিছিল।
লক্ষ মানুষ ভাত চেয়ে মরে,
লক্ষ মানুষ শোকে ভেসে যায়,
ঘরহীন ভাসে শত শত লোক
লক্ষ জননী পাগলের প্রায়।
রিফিউজি ঘরে ক্ষিধে পাওয়া শিশু,
পেটগুলো সব ফুলে ফেঁপে ওঠে
এইটুকু শিশু এতবড়ো চোখ
দিশেহারা মা কার কাছে ছোটে।

বড়ো চাচা বললেন, অনুবাদ করেছেন খান মোহাম্মদ ফারাবী। তোমরা তার নাম হয়ত শোনোনি। খুব ছোট্ট একটা জীবন পেয়েছিলেন এই প্রতিভাবান লেখক। মাত্রই ২২ বছরের জীবন। জন্ম ১৯৫২ সালে, মৃত্যু ১৯৭৪ সালে। তার একটা বই আছে 'মামার বিয়ের বরযাত্রী'। কিশোর গল্পের বই। খুব মজার মজার গল্প আছে। বইটা এখন আমার কাছে নাই। থাকলে...।

মুহিব চাচা বললেন, বইটা আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারে আছে। আমি তোমাদের দিবো, তবে ধার হিসেবে। সবাই পড়বে। পড়ে ফেরত দিতে হবে। কারণ, বইটা এখন বাজারে কিনতে পাওয়া কঠিন।

তুষার বলল, আমরা ধার হিসেবেই পেতে চাই। প্রত্যেকে একদিন করে রাখব।

তারপর বড়ো চাচা আমাদেরকে কয়েকটা ছবি দেখালেন। মানুষের ঝাঁক ছুটে যাচ্ছে। অর্ধনগ্ন দেহ। নগ্ন পা। কঙ্কালসার শরীর। মাথায়, কাঁধে পুটলি। নারীদের কোলে জীবন্ত শিশু কঙ্কাল। দেখে খুব মন খারাপ হলো আমাদের। বড়ো চাচা বললেন, তবে সেপ্টেম্বর মাস থেকেই আমরা চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। ভারতের শরণার্থী চাপ বাড়তেই থাকে। ভারতও চাচ্ছিল, বাংলাদেশ স্বাধীন হোক, শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাক। সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের মিশন উদ্‌বোধন করা হয়। এতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে 'লা ফিগারো' প্যারিস থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাতকারে বলেন, 'ভারত যদি এতে বাড়াবাড়ি করে তবে সর্বাত্মক যুদ্ধ করতে হবে।'

আর সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে গভর্নর ও প্রাদেশিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল টিক্কা খান ঢাকা ত্যাগ করেন। জামায়েত ইসলামের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জামায়েত ইসলামী সর্বশক্তি দিয়ে দেশের শত্রুদের দমনের ব্যাপারে নতুন গভর্নরকে সাহায্য করবে। ডা. এ এম মালিক ৩ তারিখে গভর্নর ভবনের দরবার হলে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে শপথ নেন। এ অনুষ্ঠানে লে. জে. নিয়াজিসহ উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি সামরিক ও বেসামরিক অফিসাররা উপস্থিত হন।

বড়ো চাচার কথার রেশ ধরে মুহিব চাচা বলেন, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সরকার থেকে একটা পেনশন পেতেন। পাকিস্তান সরকার সেই পেনশন বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে বাংলাদেশ সরকার সেটা আবার চালু করে। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখে কবির কলকাতার বাসভবনে অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলাদেশের হাই কমিশনার এম হোসেন আলী কবিকে ২১০০ রুপির একটি চেক প্রদান করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। বাকশক্তি রোহিত ছিল তাঁর। তাঁর কবিতা ও গান বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর কবিতা ও গান আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। একজন অসুস্থ কবির ওপরও ছিল পাকিস্তানি শাসকদের আক্রোশ। এ কথা জানতে পেরে ওদের প্রতি আমাদের ঘৃণার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

মুহিব চাচা একটু থেমে আবার বলেন, ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে রাওয়ালপিণ্ডির প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এই মর্মে ঘোষণা দেন যে, সবার প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন।

মুহিব চাচা মুখ ভেংচান। বিদ্রূপের হাসি হাসেন। তারপর বলেন, ওদের ক্ষমা কে নেয়? আর ওরা ক্ষমা করবারই বা কে? ওদের পাপ ও অপরাধ এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে, ওদের তখন উচিত ছিল আমাদের কাছে মাথা নত করে ক্ষমা চাওয়া। অবশ্য কয়েক মাস পরে ওরা তার চেয়েও বেশি কিছু করে। মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করে। আমাদের ভাইয়ের রক্তে ভেজা এই মাটি। লাঞ্ছিত বোনের অশ্রুভেজা এই মাটি। আমরা ওদের সব হিসাব মিটিয়ে দিতে চাই। আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলাম।

বড়ো চাচা বললেন, হ্যাঁ মুক্তিযোদ্ধারা অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। তারা প্রয়োগ করতে লাগল নতুন নতুন যুদ্ধ কৌশল। সেই সূত্র ধরেই ১৯৭১ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রথম ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় ট্রেন ধ্বংস করে। লে. মোরশেদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা আখাউড়া-হরশপুর রেললাইনে মুকুন্দপুরের কাছে ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন পুঁতে রাখেন। এর সাথে বৈদ্যুতিক তার যোগ করা হয়।

৩০০ গজ দূরে রিমোট কন্ট্রোল স্থাপন করে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান নেয়। পাকিস্তানি বাহিনীর এক কোম্পানি সৈন্য বোঝাই একটি ট্রেন অ্যাম্বুশ অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়ে মাইনের ওপর এলে মুক্তিযোদ্ধারা সুইচ টিপে মাইন বিস্ফোরণ ঘটান। এতে ইঞ্জিনসহ ট্রেনটি বিধ্বস্ত হয়। দুইজন অফিসারসহ সাতাশ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়।

বড়ো চাচা বললেন, পাকিস্তানি কুচক্রি শাসকরা তখন দিশাহারা অবস্থায়। কী করবে, কী বলবে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখে রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তান সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন, বিলুপ্ত আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক ট্রাইব্যুনালে গোপন বিচারের কাজ শেষ হয়েছে।

ওরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বন্দি রেখেছিল তা ঠিক। কিন্তু শান্তি পাচ্ছিল না। এটা ছিল ওদের জন্য আরেক বিপাক। কী করবে বুঝতে পারছিল না। শেখ মুজিবকে হত্যা করলে তার পরিণতি কী ভয়াবহ হবে সে চিন্তাও ওদের মাথায় ছিল। বাঘকে খাঁচায় বন্দি রাখাও বিপদ, ছেড়ে দেওয়াও বিপদ।

এদিকে রাজাকারদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে। রাজাকারদের সাহায্য ছাড়া অজানা-অচেনা জায়গায় আর্মিদের চলাফেরা করা বিপদ। কুষ্টিয়ার বাবলাচড়া ইউনিয়ন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান তার অধীনে ২২জন রাজাকারকে সঙ্গে নিয়ে তাদের কাছে রক্ষিত বিপুল পরিমাণ রাইফেল, মেশিনগান, শটগান, স্টেনগানসহ মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। দেশের অনেক জায়গায়ই রাজাকাররা এভাবে আত্মসমর্পণ করতে থাকে।

মুহিব চাচা বললেন, সেপ্টেম্বরের ২৩ তারিখ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'বাংলাদেশ প্রশ্ন' উত্থাপনের জন্য ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের এক অগ্রগামী ধাপ।

সেপ্টেম্বরের ২৩ তারিখেই ক্যাপ্টেন মাহাবুবের নেতৃত্বে একটি মুক্তিযোদ্ধা দল কুমিল্লার দক্ষিণে পাকিস্তান সেনাদের কংসতলা ঘাঁটিতে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর পাকিস্তানি সেনারা এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে, কংসতলা পরিত্যাগ করে তারা কুমিল্লায় চলে যেতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে সুবেদার শাহজামানসহ ১৬ জন সৈন্য নিহত ও আটজন আহত হয়। এই একই তারিখে পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তর ভারতের অস্থায়ী কমিশনারকে ডেকে সরকারিভাবে পাকিস্তান দূতাবাসের চারজন কর্মচারীকে ফেরত দেওয়ার দাবি জানায়। মূলত এসব কর্মচারী মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারে যোগ দিয়েছিল।

ছোটো চাচা বললেন-আমি লক্ষ করছি, মুক্তিযুদ্ধের এই গল্প বলায় কিছু একটা বাদ পড়ে যাচ্ছে।

আমরা সবাই বিস্ময়ভরা চোখে তাকালাম পরস্পরের দিকে। কী বাদ পড়ছে? অনেক কিছুই তো বলা হচ্ছে।

ছোটো চাচা বললেন-গল্প বলা হচ্ছে শিশু-কিশোরদের কাছে। ১৯৭১ সালে আমি ছিলাম শিশু ও কিশোরের মাঝামাঝি একজন। যদিও আমি যুদ্ধে যাইনি, সরাসরি যুদ্ধ করিনি, আমার মতো অনেক শিশু ও কিশোর তখন যুদ্ধ করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে।

বড়ো চাচা বললেন-তুইও আমাদেরকে তখন সাহায্য করেছিস। আমরা বাড়িতে ঢুকতে সাহস পেতাম না। আশপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকতাম। তুই গিয়ে আমাদের কাছ থেকে খবরাখবর আনতি, অন্যদের খবর দিতি। আবার আমাদেরকে কিছু খাবারদাবারও দিতি।

ছোটো চাচা বললেন- কিন্তু এখন পর্যন্ত কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে তেমন কিছু বলা হয়নি এ আসরে।

বড়ো চাচা এবং মুহিব চাচা দু'জনেই একটু চুপসে গেলেন। সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বাদ পড়ে গেছে।

ছোটো চাচা বললেন, এরপর থেকে প্রায় প্রতি পর্বে আমি একজন করে কিশোর মুক্তিযোদ্ধার কথা বলব।

মুহিব চাচা বললেন, উত্তম প্রস্তাব। তোমাকে সুস্বাগতম।

চা খেয়ে ছোটো চাচা বললেন- মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ

অবদানের কিছু খেতাব দেওয়া হয়। যেমন-বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিক্রম, বীরপ্রতীক। আমাদের কিছু শিশু-কিশোর মুক্তিযোদ্ধা এরকম খেতাবও অর্জন করেছে।

সেরকম খেতাবপ্রাপ্ত একজন শিশু মুক্তিযোদ্ধার নাম আবু সালেহ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। এই কিশোর মুক্তিযোদ্ধার নাম শুনলে ভয়ে রাজাকারদের বুক শুকিয়ে যেত।

আবু সালেহ সীমান্ত পেরিয়ে চলে যায় আগরতলায়। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের বাছাই করা হচ্ছিল। আবু সালেহ গিয়ে সেখানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম লেখাতে চাইলেন। কিন্তু ছোটো বলে বাছাই করার দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা ওকে নিতে চাইলেন না। তার কান্না দেখে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসাররা ওকে নিতে রাজি হলেন। আবু সালেহ নাম লেখালেন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে।

আগরতলা থেকে আবু সালেহকে নিয়ে যাওয়া হলো মেলাঘরে। মেলাঘর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। সেখানে যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে হয়ে উঠলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে শিশু মুক্তিযোদ্ধা আবু সালেহ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।

একদিনের একটা ঘটনা বলি।

একদিন ওরা যুদ্ধ করছিল এক গ্রামে। গ্রামটির নাম চন্দ্রপুর। আবু সালেহ সেই যুদ্ধে ছিল বাংকারে। সে এক ভীষণ যুদ্ধ। প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে। পাকবাহিনী ছিল সুবিধাজনক অবস্থানে। এক পর্যায়ে আবু সালেহদের দলের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হয়ে গেল। এতগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণ বাঁচানোই আসল চিন্তা। অকারণে প্রাণ দেবার সময় সেটা নয়। প্রাণ বাঁচাতে হলে পিছু হটতে হবে। কিন্তু চাইলেই যুদ্ধক্ষেত্রে পিছু হটা যায় না। শত্রুপক্ষ যদি পিছু হটার ব্যাপারটা ধরে ফেলে তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। এর জন্য ব্যাকআপ-এর দরকার। যুদ্ধ চলতে থাকবে, পিছুও হটা হবে। কিন্তু ব্যাকআপ কে দেবে? কে এই মরণ ফাঁদে পড়ে থেকে অনরবত গুলি চালাবে? কে শত্রুদের চোখে ধুলো দেবে?

কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আবু সালেহ। তাঁর বীরত্ব অমর হয়ে আছে ইতিহাসে

এগিয়ে এল ছোট্ট আবু সালেহ। ছোটো কাঁধে তুলে নিল বড়ো দায়িত্ব। সে ক্রমাগত গুলি চালাতে লাগল পাক বাহিনীর ক্যাম্প লক্ষ্য করে। আর এই ফাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গেল অন্যরা। আবু সালেহ কিন্তু গুলি থামাল না। এক সময় পাকিস্তানি আর্মিরাও পিছু হটতে লাগল। আবু সালেহ বাংকারে থেকে গুলি করেই যেতে লাগল। পাক আর্মিরা সরে গেলে গোলাগুলি বন্ধ হলো। সারারাত আবু সালেহ বসে রইল বাংকারে। রাত শেষ হয়ে ভোর এল। আবু সালেহের সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধারা ভাবল, গোলাগুলি যখন থেমে গেছে তখন আবু সালেহ নিশ্চয়ই শহিদ হয়েছে। তারা বাংকারে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক। আবু সালেহ একা বসে আছে বাংকারে। বিস্ময়ে ঘোর কাটতেই খুশিতে নেচে উঠল ওদের মন। এমন অদম্য সাহসী এক শিশু মুক্তিযোদ্ধাকে ওরা হারায়নি। ওরা আবু সালেহকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেল।

আবু সালেহ একজন খেতাবপ্রাপ্ত শিশু মুক্তিযোদ্ধা। আবু সালেহ আমাদের অহংকার। সেসময় আমরা এরকম অনেক সূর্য সন্তান পেয়েছিলাম। আর তাই একটি রক্তসাগর পারি দিয়ে হলেও স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যটাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি।

(চলবে)

বঙ্গবন্ধু

রোকসানা আক্তার মুন্নী

কোন ছবিটা আঁকব আমি
ভেবে পাই না
মনটা আমার কোনো কিছুই
খুঁজে পায় না।
শেষে মনে পড়ে গেল
একটা ছবির কথা
সে আমাদের বঙ্গবন্ধু
স্বাধীনতার নেতা।

১ম শ্রেণি, মাতৃছায়া বিদ্যা নিকেতন
নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

বঙ্গবন্ধু

মাহবুব এ রহমান

তেজোদীপ্ত ভাষণে যার
সাত কোটি লোক জাগে
সবুজ-শ্যামল দেশটা সোনার
পেলামরে যার ত্যাগে।
যার কারণে আমরা হলাম
একটি স্বাধীন জাতি
বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে
হাজার রকম খ্যাতি।
জেল-জুলুমে যাননি দমে
করতে প্রতিবাদ
হাত ধরে যার পেলাম সবে
স্বাধীনতার স্বাদ।
সবাই চিনে তাকে-
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
মহান এ নেতাকে।
এখনো যার ভাষণ শুনে
ভরে হৃদয় মন
অভাবটা তার হয় অনুভব
এখন প্রতিক্ষণ।

শিশু সুশিক্ষা

কবি লিয়াকত আলী চৌধুরী

শিশু সুশিক্ষার প্রদীপ জ্বালাবে বক্ষে,
মনের উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে।
মিথ্যা ছেড়ে সত্য কথা প্রাণে স্থান দিয়ে,
রবির মতো জ্বলো জ্ঞান সম্পদ নিয়ে।
সু-আলোর দিকে মন আকর্ষণ করো,
গুরুজনের বাক্যগুলো অন্তরে ধরো।
রত্ন তুমি যত্নে আনো মন দিয়ে কিনে,
পৃথিবীর মাঝে ছড়াবে বসন্ত দিনে।
যেদিন জ্ঞান গলায় দিবে বিজয় মালা,
সেদিন দূরে পালাবে হৃদয়ের কালা

শরৎ

সানজানা শরিফ

নীল আকাশে সাদা মেঘ ভাসে
রোদের ঝিলিক শিশির ভেজা ঘাসে
গাছের নিচে শিউলি ফুলেরা হাসে
মন ছুটে যায় কাশবনের কাছে
ঘাসফড়িংরা ফুলের বনে নাচে
এরই মাঝে শরৎ রানি আসে।

১০ম শ্রেণি
মতিঝিল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

শরতের চালচিত্র

ফরিদ আহমেদ হৃদয়

আমাদের দেশে মোট ছয়টি ঋতু আছে। আর এই ছয়টি ঋতুর একটি হলো শরৎ ঋতু। যাকে আমরা ঋতুর রানি বলে জানি।

শ্রাবণ মাস শেষ হলে ভাদ্র মাস শুরু হয়। ভাদ্র এবং আশ্বিন এই দুই মাসকে নিয়ে শরৎ ঋতু হয়।

এ সময়ে নীল আকাশে শুভ্র তুলোর ন্যায় মেঘের ভেলা ভেসে ভেসে যায়। নদীর কূল পানিতে ভরে যায়। বিলের জলে ফোটে পদ্ম, শাপলা, কলমিলতা, শালুক ইত্যাদি। কিশোরী মেয়ে ছোট্ট কোষা নৌকা দিয়ে শাপলা শালুক তোলে বিলে ঝিলে ঘুরে ঘুরে।

বাগানে ফোটে জুঁই, চামেলি, জবা, শিউলি, মালতি, বেলি, জারুল, মল্লিকা আর কামেনি। নদীর কূলে ফোটে থোকা থোকা কাশফুল। মাঠে মাঠে দেখা যায় সবুজ ধানের পরত। বিকেলবেলা ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা ঘুড়ি উড়ায় মনের সুখে নাটাই হাতে নিয়ে। এ সময়ে বকের সারি চোখে পড়ে। পুকুর জলে মনের খুশিতে ডুব সাঁতারে ভেসে বেড়ায় হাঁসের দল। ফুলে ফুলে বিরাজ করে প্রজাপতির দল, গুনগুন করে গান গায় অলি।

রাতে দেখি চাঁদ জ্বলা জোছনায় ভরা আর শিক্ত শিশির পরতে শুরু করে শরৎ এলে। এ সময়ে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। আবার কখনো দেখা যায় এই রোদ আবার হঠাৎ ঝুপ করে বৃষ্টি এসে হাজির; তখন ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা বলে দেখ দেখ শিয়ালের বিয়ে হচ্ছে।

শরৎ এলে শারদীয় দুর্গা পূজা আসে। আর হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীরা দুর্গার প্রতিমা তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় দখিনা বাতাস হালকা হিমেল গায়ে মিষ্টি দোলা দিয়ে যায়। প্রাণটা জুড়ায় সেই বাতাসে। নানান রকম পাখির কোলাহল শুরু হয় ঝাউবনে। পাখিদের বাসা বুনতে অতি ব্যস্ত হয়ে খড়কুটোর সন্ধানে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে দেখা যায়। ভোর বিহানে ঘুম ভাঙে দোয়েল, শ্যামার মিষ্টি সুরে। প্রকৃতি যেন নতুন রূপ ফিরে পায়। এ সময়ে সূর্যের তাপ তেমন থাকে না। সোনারোদে মন ছুঁয়ে যায় অচিন পুরের দিকে। সবুজ মাঠে খেলা করে ঘাসফড়িংয়ের দল। শরতে গাছে গাছে তাল পাকে আর সেই পাকা তাল দিয়ে অনেকে তালের পিঠা বানায় যা খেতে খুবই সুস্বাদু। নদীর জলে দেখা যায় পানকৌড়ি আর বালিহাঁসের খেলা। ছুঁ মেরে পানকৌড়িরা পানির নিচে থেকে মাছ ধরে আনে। কী অপরূপ দৃশ্য এই সময় দেখা যায় আসলে না দেখলে বুঝার উপায় নাই। আর শরতের বৈভব পরে বেশি গ্রামীণ জীবনে। তাই সবাই চলো গ্রামীণ জীবন ঘুরে ঘুরে শরতের এই সৌন্দর্য কাছ থেকে উপভোগ করি কেমন।

শিশির ভেজা শরতে

মিনতি বড়ুয়া

শরৎ শিশিরে ভিজে
ভৈরবী নীরবে বাজে
শিউলি ফুলের মিষ্টি সৌরভে
হই যে আকুল সাঁঝে
শিউলি তলার চারপাশেতে
ঝরা ফুলের ঘ্রাণে
মুগ্ধ হয়ে ফুল যে কুড়ায়
প্রভাত পাখির গানে।।

দুর্গাপূজা

মো. মনিরুজ্জামান মনির

পূজা এল-
পরছে বাড়ি ঢাকে
একটু পরেই
নিয়ে যাবে মাকে।
বিসর্জনের
বাজছে করুণ সুর
আজ থেকে মা
থাকবে অনেক দূর।
পূজা এল-
বাজছে আরো ঢোল
সবাই মিলে
বলছে হরি বল।
নিয়ে যাচ্ছে
আজকে মাকে তুলে
রেখে আসবে
বড়াল নদীর কূলে।
হিন্দু পূজা-
করে মনের টানে
উৎসব মনে
করে মুসলমানে।
এই উৎসবে
থাকে নানান জন
দশমীতে
মায়ের বিসর্জন।

সাদা মেঘের ভেলা

নিশাত সুলতানা

সকালের ঘুম ইরার ভারি পছন্দের। কিন্তু একটু আরাম করে ঘুমানোর উপায় আছে কি! রোজ সকালে ছয়টা বাজতে না বাজতেই ডাকাডাকি শুরু করেন মা। এ বছর ক্লাস টু তে ওঠার পর থেকে মা'র ডাকাডাকি যেন আরো বেড়েছে। মাঝে মাঝে বাবাও ডাকতে শুরু করেন মা'র সাথে। সকাল আটটার আগেই স্কুলে হাজির হতে হয়।

কিন্তু আজ প্রথমবারের মতো মা ডাকার আগেই ঘুম ভাঙল ইরার। ঘুম ভাঙার কারণটাও বড়ো অদ্ভুত। মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধ ঘুম ভাঙিয়ে দিল ইরার। মা বলছিলেন কদিন থেকেই নাকি ভোরে হালকা শীত পড়ছে। ইরা দেখল কখন যেন মা তার গায়ে একটা হালকা কাঁথা দিয়ে গেছেন। মিষ্টি গন্ধের কারণ খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ ইরার মনে পড়ে গেল গতকাল বিকেলে তার জানালার পাশে বেড়ে ওঠা শিউলি গাছে সে অনেকগুলো কুঁড়ি দেখেছিল। তাহলে কি এই মিষ্টি সুন্দর গন্ধটা শিউলি ফুলের? এর আগে ইরা কখনও শিউলি ফুল দেখেনি। কাঁথা সরিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল ইরা। এক দৌড়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল শিউলি গাছের নিচে যেন সাদাফুলের মেলা! কী সুন্দর আর শুভ্র শিউলি ফুল! ছয়টি সাদা পাপড়ি ঠিক যেন মুখমণ্ডলের মতো। আর তার মাঝখানে কমলা রঙের বোঁটা। ভারি সুন্দর দেখতে! সে মনে মনে ঠিক করল সামনের ঈদে সে সাদা আর কমলায় মেশানো একটা ফ্রক নেবে। ইরা আর ধৈর্য্য ধরতে পারল না। খুশিতে মা-বাবাকে ডাকতে শুরু করল সে। ইরার ডাকে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন ইরার মা-বাবা। তাড়াতাড়ি উঠে এলেন তারা। ইরার আনন্দ দেখে কে! মা'কে সাথে নিয়ে মনের আনন্দে শিউলি ফুল কুড়াতে শুরু করল সে। ফুলগুলো কী নরম আর কোমল! একটু জোরে স্পর্শ করলেই যেন ব্যথায় কুঁকড়ে উঠছে ফুলগুলো। মা তাকে বললেন, শিউলি ফুল স্পর্শ করতে হয় খুব আলতো ভাবে আর শিউলি ফুল খুব কম সময় সতেজ থাকে। তিনি একটা শিউলি ফুলের বোঁটা ইরার ডান হাতে ঘষে দেখালেন যে এটা থেকে কমলা রং বের হয়। তাই ছবি আঁকার কাজেও অনেকে শিউলি ফুলের বোঁটা ব্যবহার করেন। শিউলি ফুল কুড়ানো শেষ হলে মা ঘর থেকে নিয়ে এলেন সুঁই আর সুতা। ফুলগুলো দিয়ে চমৎকার করে গাঁথলেন ছোট্ট একটা মালা। ইরা ঠিক করল এই মালাটি সে তার প্রিয় শ্রেণি শিক্ষিকা সুরভি আপাকে দিবে। সুরভি আপা নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন!

নাশতার টেবিলে বসে ইরা তার বাবাকে প্রশ্ন করল, বাবা, কেন শিউলি ফুল সবসময় ফোটে না? বাবা উত্তর দিলেন, এখন শরৎকাল আর শিউলি ফুল কেবলমাত্র শরতেই ফোটে। ভাদ্র আর আশ্বিন এই দুই মাস মিলে হয় শরৎ। শরৎকালের আরেকটি বিশেষ ফুল হলো কাশফুল। ইরা ভাবছিল কাশফুলও হয়ত শিউলি ফুলের মতোই একটা ফুল। তাই সে বাবাকে প্রশ্ন করল, বাবা, কেন আমরা কাশফুল বাগানে লাগাই না? তাহলে তো আমি কাশফুল দিয়ে মালা গেঁথে সালমা আপাকে দিতে পারতাম। সালমা আপা কত সহজ করে কঠিন কঠিন অংক বুঝিয়ে দেন! বাবা হেসে বললেন, ইরাবতী মা আমার, কাশফুল বাগানে হয় না কিংবা কাশফুল দিয়ে মালাও বানানো যায় না। কাশফুল হয় খোলা মাঠে, নদীর চরে কিংবা পানির আশপাশে। মা ডিম সিদ্ধ রাখতে রাখতে বললেন, 'জানো ইরা, কাশফুল দেখতে অনেকটা ফটফটে সাদা নরম শনপাপড়ির মতো।'এটা শুনে ভারি মজা পেল নিপা। সে তার বাবা-মার কাছে বায়না ধরল আজই সে কাশফুল দেখতে যাবে। বাবা-মাও রাজি হলেন।

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন বাবা। ইরা আর মা আগে থেকেই বাইরে যাবার জন্য তৈরি ছিল। নিপা পড়েছে ফটফটে সাদা একটা জামা আর মা পড়েছেন সবুজ আর লালে মেশানো একটা শাড়ি। মাকে দেখতে ভারি মিষ্টি লাগছে! মা তালপিঠা বানিয়েছেন। খুব মজা হয়েছে। বাবা চটপট কয়েকটি তালবড়া মুখে পুরেই তাদের নিয়ে রিক্‌শায় করে রওনা হলেন শহর থেকে সামান্য দূরে নদীর ধারে। ইরা বসেছে বাবার কোলে। নদী যতই কাছে আসছে ইরা ততই অধির হয়ে উঠছে কাশফুল দেখার জন্য। বিশাল একটা ধানক্ষেত পেরিয়ে অবশেষে তারা পৌঁছল নদীর ধারে। চারদিকে শুধু সাদা সাদা কাশফুল! কাশবনের একপাশে কিছু হলুদ বুনো ফুল আর সেই ফুলগুলোর উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটি কালো ভ্রমর। পানির উপর কয়েকটি

সাদা রাজহাঁসও দেখতে পেল সে। কী ভীষণ ভালো লাগছে তার! এত সাদার মাঝে সাদা জামা পরা ছোট্ট ইরা যেন এক সাদা পরি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে স্বপ্নপুরীতে। সে আকাশের দিকে তাকাল। দেখল পরিষ্কার নীল আকাশে দ্রুতগতিতে ভেসে যাচ্ছে সাদাসাদা মেঘ। এত সুন্দর আকাশ ইরা কখনো দেখেনি। মা গেয়ে উঠলেন, আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলা, নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা। হঠাৎ দূর থেকে তার কানে ভেসে এল ঢাকের আওয়াজ। চমকে উঠল ইরা। মা'র কাছে জানতে চাইল এই শব্দ কিসের। মা বললেন, আজ থেকেই শুরু হয়েছে দুর্গাপূজা। তাই এই ঢাকের শব্দ পূজামণ্ডপ থেকে আসছে। ইরার মনে পড়ে গেল তার প্রিয় বান্ধবী কৃষ্ণা তো বলেছিল পূজার কথা। কাশফুল, নীলআকাশ, প্রজাপতি, ভ্রমর, রাজহাঁস, ঢাকের আওয়াজ সব মিলিয়ে ভারি আনন্দ হলো ইরার। বাবার মোবাইলে অনেকগুলো ছবি তুলল তারা সবাই মিলে। অবশেষে সূর্য ডোবার ঠিক আগে আগে আবার রিকশায় উঠে বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো তারা। ডুবন্ত সূর্যের লাল আভা তখন ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

শরৎ শোভা

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

শরৎ শোভা মনোলোভা
মনকে নাচায় তাধিন ধিন
সাদা মেঘের ফাঁক গলিয়ে
সূর্য পেল স্বাধীন দিন।
স্বাধীন মানে তাধিন নাচে
নদীর পাড়ে কাশের বন
ঝিরিঝিরি শারদ হাওয়ায়
দুলছে যেন বাঁশের বন।
বাঁশের বনে ঘাসের বনে
পাশের বাড়ির হাঁসের পাল
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক ডাকছে শুনে
ফুল্ল মনে হই মাতাল।
মাতাল বায়ে উথাল পাথাল
মন ছুটে যায় শরতে
মেঘের পরশ জাগায় হরষ
সব হৃদয়ের পরতে।

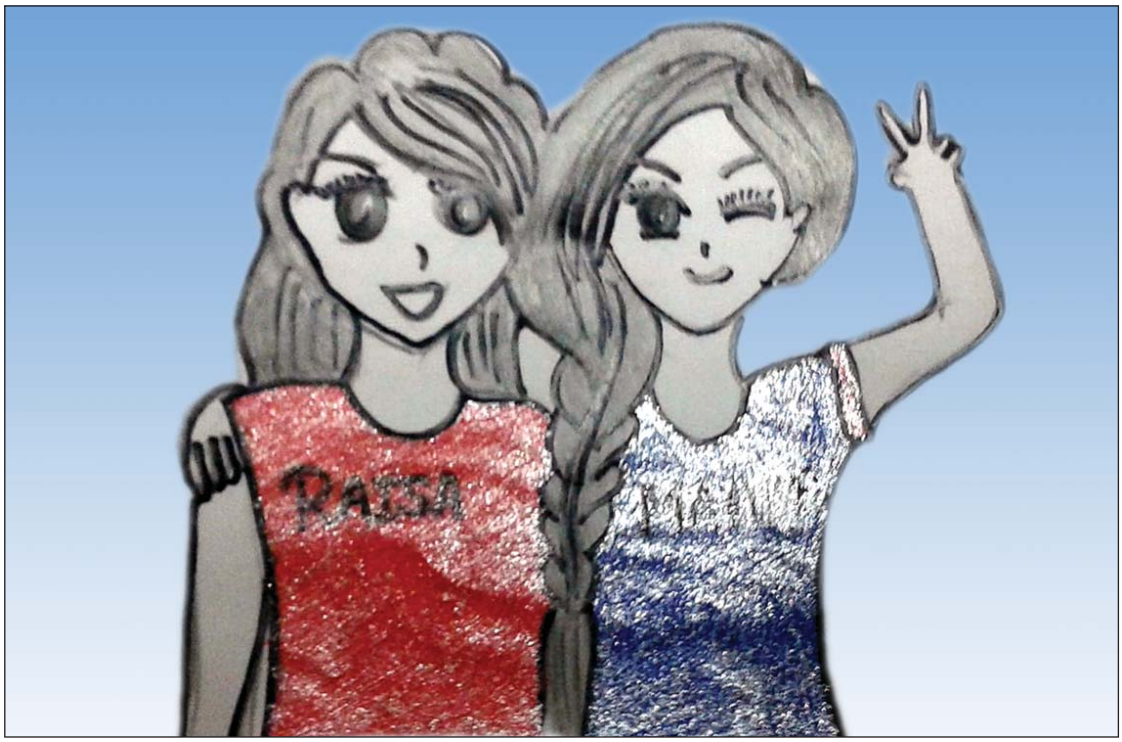

স্বর্ণা রহমান, একাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

আমার কিছু কথা আছে:

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে বলে আমি ভাবি। যারা এখনো ছোটো, তারা কেন বড়ো হতে পারবে না? তার আগেই কেন তাদেরকে বিয়ে দিতে হবে? নবারুণ-এর মাধ্যমে আমি সবাইকে বলতে চাই, বাল্যবিয়ে বন্ধ হোক।

------নূর-এ-আলম সোহান, দশম শ্রেণি, গঙ্গাচড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

নবারুণ: ধন্যবাদ তোমাকে। খুব সুন্দর করে সত্যি কথাটি বলেছ। দেশের আইন অনুযায়ী ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে কোনো মেয়েশিশুকে বিয়ে দেওয়া যাবে না। আর আইন অনুযায়ী ২১ বছর বয়স না হলে কোনো ছেলেশিশুকেও বিয়ে দেওয়া যাবে না। আইন অমান্য করলে আছে কঠোর শাস্তির বিধান। তবে, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সমাজের সবাইকে সচেতন হতে হবে। লাল কার্ড দেখাতে হবে বাল্যবিয়েকে। লাল কার্ড দেখানোর এরকম খবর তো প্রায়ই পাচ্ছি পত্রিকাতে। এ বিষয় নিয়ে রইল একটি গল্প। পড়ে দেখো তো, কেমন লাগে।

বাল্যবিয়েকে লালকার্ড

কবির কাঞ্চন

এই সায়ীদ, আজ সন্ধ্যায় বাবার সাথে লাল সাইকেল ওয়ালা লোকটার সম্পর্কে আলাপ দিতে হবে। মনে রাখিস কিন্তু। স্কুল হতে বাসায় ফেরার পথে সায়েম সায়ীদকে বলল।

সায়ীদ ও সায়েম দুই ভাই। সায়ীদ নবম শ্রেণিতে আর সায়েম পড়ে দশম শ্রেণিতে। দুজন বিজ্ঞান বিভাগে পড়ে। বাবার আয় সীমিত হওয়ায় সবকিছুতেই ওদের হিসাব করে চলতে হয়। ওদের বাবা, গিয়াসুদ্দিন খান একটি বেসরকারি বীমা কোম্পানিতে চাকরি করেন। সারাদিন অফিসে কাজ করার পর আবার বাসায় এসেও কাজ করেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রিয় সন্তানদের সবকিছুর নিয়মিত খোঁজ রাখেন।

সায়ীদ ও সায়েম দুজনেই বেশ কৌতূহল প্রিয়। নতুন কোনো বিষয় ওদের সামনে এলেই তার নাড়িনক্ষত্র পর্যন্ত দেখে ছাড়বে। প্রয়োজনে ছুটে যাবে।

গিয়াসুদ্দিন খান প্রতিদিন সন্ধ্যায় নানান ব্যস্ততার মাঝেও ছেলেদের পড়াশুনায় সময় দেন। রুটিন মাফিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পড়ার টেবিলে বসার পর ওরা একটানা দেড় ঘণ্টা পড়ে। দশ মিনিট বিরতির পর আজকের দৈনিকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা চলে বাবা-ছেলের মধ্যে।

আজ গিয়াসুদ্দিন খান সায়ীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী খবর আমার খুদে গোয়েন্দারা। নতুন কোনো বিষয়ের সন্ধান পেয়েছ কী?

সায়ীদ চোখেমুখে বিস্ময় এনে বলল, বাবা, আজকের পত্রিকায় নতুন একটা বিষয় পেয়েছি। একজন লোক গত দুই যুগ ধরে শুধু লাল পোশাক ব্যবহার করছেন। তিনি লাল রঙের জিনিস ব্যবহারের মাধ্যমে নাকি সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে চান।

- অদ্ভুত তো!

- সেই অদ্ভুত রহস্যকে আমরা উন্মোচন করতে চাই। প্লিজ বাবা উনার সাথে আমাদের দেখা করার ব্যবস্থা করে দাও।

সায়ীদ পেপারটা বাবার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এখানে উনার ঠিকানা আছে।

গিয়াসুদ্দিন খান এক নজরে পেপারের দিকে তাকালেন। এরপর বললেন, শোনো, আগামী বৃহস্পতিবার স্কুল ছুটির পর তোমাদের সাথে করে আমি উনার কাছে নিয়ে যাব।

বাবার মুখ থেকে এই কথা শুনে দুজন আনন্দে আত্মহারা।

বৃহস্পতিবার। দুই ছেলেকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন গিয়াসুদ্দিন খান। বগুড়ার উদ্দেশ্যে গাড়ি ছুটে চলছে। পরদিন সকাল নয়টার দিকে বগুড়া বাস টার্মিনালে এসে গাড়ি থামল। এরপর অটোগাড়িতে চড়ে আনোয়ার

হোসেনের বাড়ি পৌঁছে যায় তারা। আনোয়ার হোসেন তখন নিজের সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ হবে। পুরো মুখ জুড়ে ঘন কালো দাড়ির ফাঁকে ফাঁকে হাতে গোনা কয়েকটা ধবধবে সাদা দাঁড়ি। মাথায় লাল রঙের ক্যাপ। পরনে তার লাল জামা, লাল পায়জামা, লাল রঙের জুতা। একটি ছোটো হাত ব্যাগ সবসময় তার ডান কাঁধে ঝুলে থাকে। সেটিও লাল। বয়স বাড়ার সাথে সাথে দৃষ্টিশক্তিও কমতে শুরু করেছে। ইদানীং চশমা পরেন। চশমার ফ্রেমও লাল। হাতের সাইকেলটিও লাল রং মাখা।

আগন্তুক তিনজন লোককে দেখে সাইকেলটা ঘরের সামনে রেখে এগিয়ে আসেন তিনি। গিয়াসুদ্দিন খান সালাম দিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই আনোয়ার সাহেব।

জী, আমিই আনোয়ার হোসেন। কিন্তু আপনাদের ঠিক চিনতে পারছি না।

গিয়াসুদ্দিন খান এবার বললেন, আমি গিয়াসুদ্দিন খান। এরা আমার দুই ছেলে সায়ীদ আর সায়েম। আমরা এখানে এসেছি আপনার সাথে কথা বলতে। আমার ছেলেরা নতুন কোনো বিষয়ের সন্ধান পেলে তার আসল রহস্য জানার জন্য উঠেপড়ে লাগে। ওদের এমন কৌতূহল আমার ভালো লাগে। আমি ওদের সাথে করে নিয়ে যাই। গত কয়েকদিন আগে পত্রিকায় আপনাকে নিয়ে একটা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবেদনটি পড়ে আপনার সাথে ওদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে ওরা বায়না ধরে। তারপর আপনার কাছে আমাদের আসা।

আনোয়ার হোসেন খুশি মনে মেহমানদের ঘরে নিয়ে বসতে দেন। এরপর নাশতার পর্ব সেরে সায়ীদ ও সায়েমের সামনাসামনি বসে বললেন, - তো বাবারা, তোমরা আর কী জানতে চাও?

সায়েম বলল, আঙ্কেল, আপনার ব্যবহৃত সবকিছু লাল রঙের। আপনি সবসময় লাল জিনিস নিয়ে চলেন কেন?

শোনো বাবা, বাল্যবিবাহ বিপজ্জনক। সেই ভয়াবহতাকে বোঝাতে আমি সবসময় লাল নিয়ে চলি।

পাশ থেকে সায়ীদ জিজ্ঞেস করল, বাল্যবিবাহের সাথে এই লাল রঙের সম্পর্ক কী?

আনোয়ার হোসেন নিজের জামার সামনের অংশের এক পাশে সাদা সুতোর বুননে লেখাটি দেখিয়ে বললেন, এই দেখো। এখানে সব লেখা আছে। বাল্যবিয়েকে লাল কার্ড দিন। আমাদের সমাজ থেকে চিরতরে বাল্যবিয়েকে বিতাড়িত করতে হবে। যেমন করে অখেলোয়াড় সূচক আচরণের জন্য লাল কার্ড দেখিয়ে একজন খেলোয়াড়কে খেলার মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়।

আচ্ছা, আপনার সাইকেলটা লাল রঙের। আবার হ্যান্ডমাইকটাও লালচে। এত এত যানবাহন থাকতে আপনি সাইকেলই বা কেন বেছে নিলেন?

তিনি বললেন, দেখো, আমি খুব গরিব মানুষ। সংসার খরচ চালাতে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হয়। এই প্রচারণার জন্য আমাকে একেকবার একেক জায়গায় যেতে হয়। আগে রিক্সা চালাতাম। কিছু টাকা জমিয়ে একটি সাইকেল কিনলাম। এরপর পুরো সাইকেলে লাল রং মেখে নিই। এখন এই সাইকেলে চড়ে দূরদূরান্তে যেতে পারি। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে গিয়ে অ্যাসেম্বলির সময়ে শিক্ষার্থীদের সাথে বাল্যবিয়ের কুফল নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

এরপর আবার বললেন, আমি একটা জিনিস মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। যে-কোনো ধরনের পরিবর্তনের শুরুটা প্রথমে একজন দিয়েই হয়। বাল্যবিবাহ আমাদের এই সমাজের জন্য এক মারাত্মক হুমকি। এ উদ্যোগ আমি শুরু করেছি। আমার বিশ্বাস এই সমস্যা প্রতিহত করতে দেশের সচেতন নাগরিকরাও এগিয়ে আসবেন।

সায়ীদ ও সায়েম গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছে। সায়েম আবার বলল, এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা কোথা থেকে আসে?

তিনি বললেন, আয়-রোজগারের উদ্দেশ্যে আমি চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চলে আসি। এক সময় নাজিরপুল এলাকায় কক্সি মার্কেটে একটি ফার্নিচারের দোকানে ডিজাইনের কাজ করতাম। এরপর অবসর সময়ে রিক্সা চালাতাম। রিক্সা চালিয়ে সংসার খরচ চালিয়ে নিতাম। হাতে কিছু টাকা জমা হলে তা দিয়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী প্রচারণা চালাতাম। লিফলেট ছাপিয়ে তা সাধারণের হাতে পৌঁছে দিতাম। অবশ্য শীত মৌসুমেই আমি প্রচারণায় নামি। বছরের বাকি সময়টা রিক্সা চালিয়ে কাটিয়ে দিই।

এতে আপনার ব্যক্তিগত কোনো লাভ হয় কী?

হ্যাঁ, আমার ব্যক্তিগত লাভ নিশ্চয়ই আছে। আমি একে আমার সামাজিক দায় বলে মনে করি। সমাজ থেকে এই ধরনের মারাত্মক ব্যাধি তাড়িয়ে সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারাটাই আমার লাভ।

কখনো এই কাজে কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে কী?

হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে কেউ কেউ এগিয়ে আসেন। আগে কেউ কেউ আড়চোখে তাকালেও এখন সবাই সমর্থন করেন। আমার সামনে যেই লাল বর্ণের হ্যান্ডমাইকটা দেখছ সেটিও একজন মহান ব্যক্তি দান করেছেন।

কখন থেকে এই প্রচারণায় নেমেছেন আঙ্কেল?

১৯৯৩ সাল থেকে।

সায়ীদ ও সায়েমের চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ স্পষ্ট। একজন মানুষ সামাজিক দায়বদ্ধতাকে মাথায় নিয়ে নিজের সুখকে বিসর্জন দিয়েছেন। সত্যি এমন মানুষ সব সমাজের জন্য আশীর্বাদ। এসব ভাবতে ভাবতে সায়ীদ আবার বলল, আচ্ছা, সমাজে এত সমস্যা থাকতে আপনি বাল্যবিবাহ নিয়ে প্রচারণায় নেমে পড়লেন কেন?

আনোয়ার হোসেন বেশ কিছু সময় মাথা নিচু করে নীরব থাকেন। এরপর আর্দ্র গলায় বললেন, আমার বড়ো বোনের দুইটি আদরের মেয়ে ছিল। শিউলির বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর আর মনোয়ারার বয়স ছিল ১৫ বছর। আমার বোন ও দুলাভাই ভুল করে এই অল্প বয়সে তাদের বিয়ে দিয়ে দেন। অল্প বয়সে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে যায় ওরা। এরপর স্বামীরা যৌতুকের দায়ে অত্যাচার করত। এক সময় ওদেরকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। বাবা-মা'র অভাব অনটনের সংসারে খুব দুঃখ কষ্টেই তাদের দিন কাটতে লাগল। এর-ই মধ্যে আমার দুলাভাই এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। শেষে নিরুপায় হয়ে ওরা দুইবোন পোশাক কারখানায় চাকরি নেয়। তখন দুজনে শপথ নেয়, ওরা সবাইকে বাল্যবিয়ের সমস্যা নিয়ে বলবে। ওদের জীবনের এমন হতাশা দেখেই আমিও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচারণায় নামি। জানো, কেবল কন্যাশিশুরা নয়, ছেলেশিশুরাও বাল্যবিয়ের শিকার হচ্ছে। এদের পড়ালেখা নষ্ট হয়, অল্প বয়সে রোজগার করতে নামতে হয়। মোট কথা, জীবনটা সুন্দর করে সাজানোর সুযোগ ওরা পায় না।

কথাগুলো বলতে বলতে আনোয়ার হোসেন পকেট থেকে একটি লাল রুমাল বের করে চোখের জল মুছতে লাগলেন।

সায়ীদ সায়েমেরও চোখ ভিজে আসে। বুঝতে পারে, বাল্যবিয়ের শিকার যেন কোনো শিশু না হয়, সে ব্যাপারে জোর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

কবিতা

ব্রত রায়-এর ডাবল ছড়াক্কা

আয়না

সুমন মিয়ার বয়েস আঠারো
পড়াশোনা করে না সে
দেখা যায় তারে রোজ মেয়েদের
কলেজের আশপাশে!

চুলে তার আছে বাহারি কাটিং,
পোশাকেও চকমক,
চোখে সানগ্লাস, তারপরে আছে
আয়না দেখার শখ!

তার সাথে থাকে এই এলাকার
বখাটে ছেলের দল
সুমনের বাপ মেম্বার সাব
আর্থিকও স্বচ্ছল!

তিথি বেগমের একাদশ শ্রেণি
দেখতেও তিথি ভালো
গরিব ঘরের মেধাবী কন্যা
আঁধারে আশার আলো!

সুমন মিয়ার কুনজরে পড়ে
ষোলো বছরের তিথি
বাজে ইঙ্গিত, অশালীন চিঠি,
নানারূপ ভয়ভীতি!

দিনমজুরের কাজ করে বাপ
হাবাগোবা তার ভাই
তিথির দুঃখ জানানোর আর
জায়গা কোথাও নাই!

সুমনের বোন শুকতারা বানু
মাত্র নবম শ্রেণি
ধনীর দুলালি স্কুলে যায়
দুলিয়ে দুইটি বেণি!

সেদিন ফিরল বিকেলবেলায়
দুই চোখে তার পানি
ঘটনাটা এই - মেয়েকে করেছে
কেউ আজ পেরেশানি!

ইকবাল মিয়া শহরেই থাকে
গ্রামে আসে মাঝেমাঝে
বড়োলোক বাপ কিন্তু ছেলেটি
স্বভাবে ভীষণ বাজে!

ফাঁকা রাস্তায় শুকতারা আজ
নাজেহাল তার হাতে
খবর শুনেই জ্বলেছে সুমন,
লেগেছে ঘা খুব আঁতে!

ইকবাল আরো বড়ো বদমাশ
বাপ তো চেয়ারম্যান
শক্তি-প্রভাবে অনেক ওপরে
সুমন পারবে ক্যান?

শুকতারা শুধু অভিশাপ দেয়,
কেঁদে কেটে হয় সারা
মেয়েদের যারা টিজ করে পথে
পশু অধম তারা!

আদরের বোন বিছানায় শুয়ে
কেঁদে যায় ফুলে ফুলে
সুমন মিয়ার মুখখানি কেন
লজ্জায় যায় ঝুলে?

আয়নার দিকে তাকিয়ে সেদিন
কেঁপে ওঠে তার বুক
আয়নার মাঝে দেখতে পেল সে
একটা পশুর মুখ!

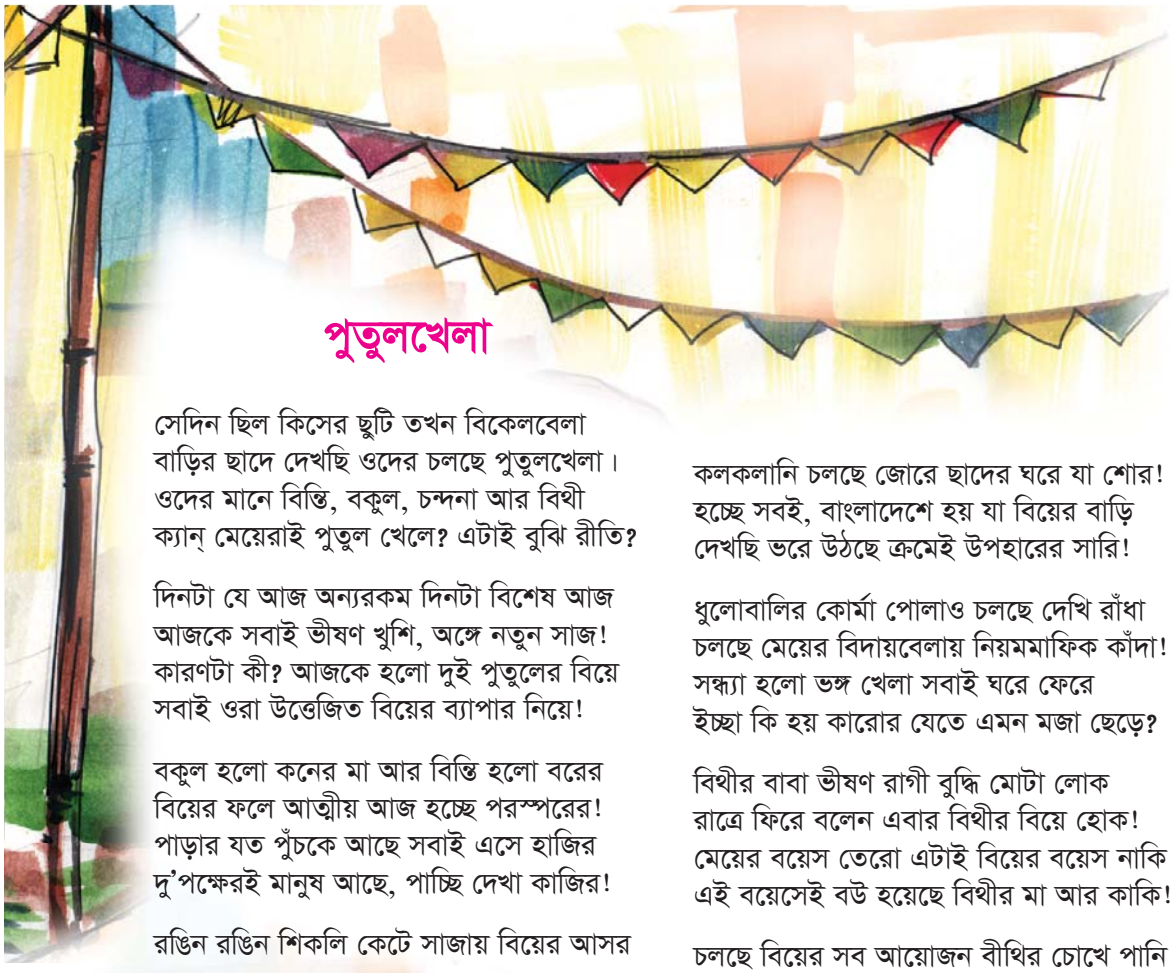

পুতুলখেলা

সেদিন ছিল কিসের ছুটি তখন বিকেলবেলা
বাড়ির ছাদে দেখছি ওদের চলছে পুতুলখেলা।
ওদের মানে বিন্তি, বকুল, চন্দনা আর বিথী
ক্যান্ মেয়েরাই পুতুল খেলে? এটাই বুঝি রীতি?

দিনটা যে আজ অন্যরকম দিনটা বিশেষ আজ
আজকে সবাই ভীষণ খুশি, অঙ্গে নতুন সাজ!
কারণটা কী? আজকে হলো দুই পুতুলের বিয়ে
সবাই ওরা উত্তেজিত বিয়ের ব্যাপার নিয়ে!

বকুল হলো কনের মা আর বিন্তি হলো বরের
বিয়ের ফলে আত্মীয় আজ হচ্ছে পরস্পরের!
পাড়ার যত পুঁচকে আছে সবাই এসে হাজির
দু'পক্ষেরই মানুষ আছে, পাচ্ছি দেখা কাজির!

রঙিন রঙিন শিকলি কেটে সাজায় বিয়ের আসর
কলকলানি চলছে জোরে ছাদের ঘরে যা শোর!
হচ্ছে সবই, বাংলাদেশে হয় যা বিয়ের বাড়ি
দেখছি ভরে উঠছে ক্রমেই উপহারের সারি!

ধুলোবালির কোর্মা পোলাও চলছে দেখি রাঁধা
চলছে মেয়ের বিদায়বেলায় নিয়মমাফিক কাঁদা!
সন্ধ্যা হলো ভঙ্গ খেলা সবাই ঘরে ফেরে
ইচ্ছা কি হয় কারোর যেতে এমন মজা ছেড়ে?

বিথীর বাবা ভীষণ রাগী বুদ্ধি মোটা লোক
রাত্রে ফিরে বলেন এবার বিথীর বিয়ে হোক!
মেয়ের বয়েস তেরো এটাই বিয়ের বয়েস নাকি
এই বয়েসেই বউ হয়েছে বিথীর মা আর কাকি!

চলছে বিয়ের সব আয়োজন বীথির চোখে পানি
বিয়ের না এ পুতুল খেলার বয়েস বলেই জানি!
আমরা বিয়ে আটকাতে চাই চুপ কেন আজ থাকি?
দেরি হওয়ার আগেই চলো থানা-পুলিশ ডাকি!

অনুবাদ গল্প

আনন্দপুরী

মাসুমা রুমা

‘এই বাড়িটার দিকে তাকাও। কী সুন্দর বাড়িটা!’ -পিগি তার ভাই গিগিকে বলল।

বাড়িটা দেখে গিগির চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। সে পিগিকে বলল- ‘সত্যি তো...বাড়িটা খুব সুন্দর। দেখে মনে হচ্ছে বাড়িটা যেন হাসছে।’

‘চলো, আমরা বরং ভেতরে গিয়ে দেখে আসি।’- গিগি বলল। তারা দু’ভাই মুচকি হেসে, তিড়িংবিড়িং লাফিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। বাড়ির ভেতর ঢুকে তাদের মনে হলো, সবগুলো দরজা-জানালা হাসছে। এত বেশি হাসছে যে, যে-কোনো সময় সেগুলোর পেট ফেটে যাবে।

পিগি তখন অবাক হয়ে গিগিকে বলল- ‘ভাই, আমার কেমন যেন সব অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে- এই বাড়িটার ভেতর যা যা আছে সবকিছুই হাসছে।’

গিগি বলল- ‘আরে ভাই, আমি কারো মুখচাপা হাসির শব্দও শুনতে পাচ্ছি।’

ঠিক তখনই পিগি সিলিং ফ্যানের দিকে তাকাল। বলল- ‘দেখো.. দেখো.. দেখো! এই পাখাটা হাসছে।’

‘হুম। আসলে তোমরা দু’জনেই অনেক ভালো এবং দয়ালু। তাই তোমাদের এখানে দেখতে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত।’- পাখা মুচকি হেসে বলল।

পিগি পেছন ঘুরে হেসে বলল- ‘আচ্ছা, এটা কী জাদুর বাড়ি?’

‘হতে পারে...নাও হতে পারে। হা হা হা !’ খাবার টেবিলটা খুব জোরে হেসে হেসে বলল।

আসলে আমরা রোজ খেলার মাঠে তোমাদের খেয়াল করতাম। আমরা খুবই আনন্দ পেতাম যখন দেখতাম তোমরা কাউকে সাহায্য করছ। নীল রঙের গোলাপওয়ালা গোলাপি ফুলের টবটা সামনে এগিয়ে এল। তারপর গোলাপ ফুলগুলো মাথা নাড়িয়ে দুই ভাইয়ের তারিফ করতে লাগল।

পিগি আর গিগি তখন কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। তারা একে অন্যের মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। একটু পর গিগি বলল- কিন্তু আমরা কোথায় কখন কাকে কী সাহায্য করেছি সেটা কেউই মনে করতে

পারছি না।

‘একদিন রাস্তায়, তোমরা একটা আহত কুকুরছানাকে খুঁজে পেয়েছিলে। তোমরা দু’ভাই মিলে কুকুরছানাকে ব্যথার মলম লাগিয়ে দিয়েছিলে। তাকে বিস্কুটও খেতে দিয়েছিলে। কুকুরছানাটা ক্ষুধার্ত ছিল।’

ঘরের এক কোনা থেকে একটা নরম কণ্ঠ ভেসে এল। ‘আরে ! এটা আবার কে?’ পিগি ঘাড় বাঁকা করে খাবার টেবিলের নিচে তাকাল।

‘আমি...এটা আমি...জানালা হয়ে এদিকে তাকাও’, বেগুনি রঙের পর্দাটা হাসিমুখে বলল।

‘কিন্তু আমরা দুজনেই ঘটনাটি ভুলে গেছি। আমরা যা করেছি সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ কোনো অনুভূতিও নেই।’ গিগি কোনোরকম গর্ব না করেই উত্তর দিল।

‘হ্যাঁ...এমনই তো হওয়া স্বাভাবিক। কারণ অন্যকে সাহায্য করা তোমাদের স্বভাবের মধ্যেই পড়ে। এই বাড়িটা তোমাদের মতো ভালো ছেলেমেয়েদের বরণ করার অপেক্ষাতেই থাকে। যারা সবসময় অন্যকে সাহায্য করার জন্য তৈরি থাকে।’

গিগি সহজসরল ভঙ্গিতে জানতে চাইল- ‘আচ্ছা, আমাদের বন্ধুরাও কি এখানে আসতে পারবে? তারাও অনেক ভালো।’

‘কেন নয়? আমরা তোমাদের সবার জন্যই অপেক্ষা করে থাকব, ঘরের একেবারে শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা দেয়াল হেসে বলল।’

পিগি তখন বলল- ‘তোমাদের সবার কথা আমরা দু’ভাই আমাদের বন্ধুদের বলব। ওদের সবাইকে এখানে নিয়ে আসব। সবাই মিলে ভীষণ মজা হবে।’

পিগি আর গিগি দু’জনেই হেসে লুটোপুটি খেল। এরপর দু’ভাই ‘আনন্দপুরী’ থেকে বেরিয়ে এল। তারা তাদের মা-বাবা-বন্ধুদের সঙ্গে তাঁদের চমৎকার অভিজ্ঞতাগুলোও ভাগাভাগি করে নিল।

গল্পকারের পরিচিতি

ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন গল্পকার মঞ্জুরি শুকলা। তিনি লেখালেখির পাশাপাশি শিক্ষকতা ও উপস্থাপনার পেশার সঙ্গে জড়িত। শিশুদের জন্য ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় প্রায় ২৫০টির মতো গল্প লিখেছেন। স্বনামধন্য পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত দুটি শিশুতোষ বইয়ের নাম- ‘Sweety’s Rainy Day’ এবং ‘Jadu Gubbare’. লেখালেখিতে অর্জন করেছেন বেশ কিছু পুরস্কার। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

বয়ঃসন্ধিকালীন খাবার

জামাল উদ্দিন

দশ থেকে উনিশ বছর পর্যন্ত বয়সকে বয়ঃসন্ধিকাল ধরা হয়। এ সময় ছেলেমেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি ঘটার পাশাপাশি মানসিক বিকাশ ঘটে। এ সময় সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথেও তারা যুক্ত হয়। পরিবারের সদস্যদের চেয়ে বাইরের মানুষের সঙ্গে বিশেষ করে বন্ধুদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে থাকে কিশোর-কিশোরীরা। পুষ্টিবিদদের মতে, বয়ঃসন্ধিকালে সুষম খাবার খাওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাবার তালিকায় ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও পানি এই ছয়টি উপাদান থাকতে হবে। কিশোর-কিশোরীদের প্রতিদিনের খাবারে ২২০০ ক্যালরি থাকতে হবে। খাদ্য তালিকার মধ্যে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি অবশ্যই থাকতে হবে। সাধারণত প্রতিদিন ২-৩ লিটার পানি পান করতে হবে। বাইরের খাবার ও কোমল পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। কোমল পানীয়ের পরিবর্তে ডাবের পানি বা লেবুর শরবত খাওয়া ভালো। শাকসবজি, মাছ, মাংস, ডালজাতীয় খাবারের সঙ্গে মিষ্টি অথবা টক ফল খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে। কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রতিদিনের একটি খাদ্য তালিকা-

সকাল: রুটি, ডিম, সবজির সঙ্গে এক গ্লাস দুধ বা দুধের তৈরি যে-কোনো খাবার।

বেলা ১১টা: বিস্কুট অথবা মুড়ি। সঙ্গে যে-কোনো একটি ফল খেতে হবে।

দুপুর: দুপুরে ভাতের সঙ্গে সপ্তাহে ৩-৪ দিন মাছ খেতে হবে। মুরগি সপ্তাহে ১-২ দিন খেতে হবে। এছাড়া শাকসবজি খেতে হবে। গরু বা খাসির মাংস সপ্তাহে একদিন খেলেই ভালো।

বিকেল: বিকেলের নাশতায় নুডলস, বিস্কুট, ছোলাভুনা, মুড়ি ইত্যাদি থাকতে পারে। বাইরের তৈরি তেলজাতীয় খাবার যেমন: পিয়াজু, বেগুনি, ফ্রায়েড চিকেন, গ্রিল চিকেন এগুলো না খাওয়াই ভালো।

রাত: রাতের খাবারে ভাতের পরিমাণ কমাতে হবে। সালাদ, শাকসবজির সঙ্গে মুরগি থাকতে পারে। ঘুমানোর আগে এক গ্লাস দুধ খেতে হবে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

আজকের আধুনিক দুনিয়াতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হলেও সারা পৃথিবীর সব মানুষ আজও শিক্ষার আলো গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকি নিজের নাম পরিচয়ও লিখতে পারে না লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাদের সাক্ষরতা দানের উদ্দেশ্যে ইউনেস্কো ৮ সেপ্টেম্বরকে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ইউনেস্কোর উদ্যোগে ১৯৬৫ সালে ৮-১৯ সেপ্টেম্বর ইরানের তেহরানে বিশ্ব সাক্ষরতা সম্মেলন হয়। ওই সম্মেলনে প্রতিবছর ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ৮ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তবে ইউনেস্কো ১৯৬৬ সাল থেকে এ দিবসটি উদযাপন করলেও বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রথম এ দিবসটি পালন করা হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে এ দিবসটি বাংলাদেশ পালন করে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হলো- 'অতীতকে জানব, আগামীকে গড়ব'।

গত ১০ বছরে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ২৬ দশমিক ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে রেকর্ড পরিমাণ ৭২ দশমিক ৭৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের সাক্ষরতার হারের উপর ইউনেস্কো ইনস্টিটিউট ফর স্ট্যাটিসটিক্স-এর ২০১৬ সালের সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ পায়।

পৃথিবীর সব মানুষকে নিজেদের অন্যতম মৌলিক অধিকার শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই মূলত এই দিবসটির প্রচলন হয়েছে। সারা বিশ্বে লক্ষ করলে দেখা যায় সাক্ষরতার হার যাদের বেশি বৈশ্বিক উন্নয়নে তারাই এগিয়ে। সাক্ষরতা সমাজ গঠনের মূল চালিকাশক্তি। টেকসই সমাজ গঠনের জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তা সাক্ষরতার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। সাক্ষরতা বলতে সাধারণত অক্ষর জ্ঞানসম্পন্নতাকে বোঝানো হলেও বর্তমানে এর সংজ্ঞা আরো ব্যাপক। প্রথমত যে ব্যক্তি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোটো বাক্য পড়তে ও লিখতে পারবে এবং দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ হিসাব নিকাশ করতে পারবে। বর্তমানে সারা বিশ্বে এই সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে সাক্ষরতার হিসাব করা হয়।

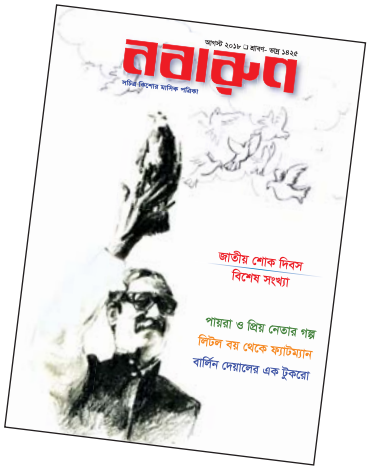

নবারুণ বন্ধুদের খোঁজখবর

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

নবারুণ বন্ধুরা তোমরা কেমন আছ? তোমরা যে নবারুণ খুব পছন্দ করে পড়ো তা আমরা জানি। তোমাদের মতামত পেতে খুব ভালো লাগে। তোমাদের মনের কথা বা মতামত পাঠাতে পারো আমাদের নবারুণ ঠিকানায়। নবারুণে তোমাদের মতো অনেক বন্ধুদের লেখা আমরা প্রতিনিয়ত পাচ্ছি। তার মধ্যে আজ দুজন বন্ধুর কথা তোমাদের বলব। নবারুণ বন্ধু আপন এবং ইমরান আমাদেরকে লিখে পাঠিয়েছে-

আপন: আমি নবারুণ খুব ভালোবাসি। আমি নবারুণ-এর গ্রাহক হতে চাই।

নবারুণ: ধন্যবাদ আপন। তুমি নবারুণ-এর গ্রাহক হতে চাও জেনে খুশি হলাম। তুমি বিকাশ নম্বর ***০১৫৩১৩৮৫১৭৫***- তে যোগাযোগ করে গ্রাহক চাঁদা দিলেই প্রকাশের পরই তোমার বাড়ি পৌঁছে যাবে নবারুণ।

ইমরান: ইনবক্সে লেখা পাঠানো যাবে?

নবারুণ: ধন্যবাদ ইমরান তোমার প্রশ্নের জন্য। তুমি লেখা ও ছবি আমদের ই- মেইলে পাঠাতে পারো। ই-মেইলে লেখা পাঠালে অবশ্যই sutonnyMJ font এ পাঠাবে। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা: editornobarun@dfp.gov.bd.

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে নবারুণ বন্ধু ফয়জুল্লাহ আমিন কিবরিয়া 'বাবা' এবং 'মা' কে নিয়ে খুব সুন্দর দুটি কবিতা পাঠিয়েছে। ফয়জুল্লাহ ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষার্থী।

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-43, No- 3, September 2018, Tk-20.00

বিন্তি প্রতিকা, সপ্তম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা